শিলাদিত্য

শারদীয়া

শারদীয়া • ১৩৮০ • বর্ষ—৩ সং—১৭

use contract with :

M/s. VENUS & CO.

Printers, Stationers & General Order Suppliers.

14/2, OLD CHINA BAZAR STREET, CALCUTTA-1.

Office :
Room No. 81. 1st. floor.
Phone No. 22-3821

Workshop :
Room No. 23, ground floor.
Phone No. 22-3821

৺শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

"আনন্দ উৎসবের দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবার মাত্রই চিন্তা করেন, অতিথি-অভ্যাগতদের খাঁটি দেশী মিষ্টান্ন কোথা থেকে খাওয়াবেন —আমরা সে ভাবনার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছি চলে আসুন নিশ্চিন্ত মনে

সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

প্রোঃ—যূথিকা রাণী সরকার
নব বারাকপুর ষ্টেশন রোড (পশ্চিম) ২৪ পরগণা।

With best compliments to all from

International Food Packers (P) Ltd.

5, OUTRAM STREET, CALCUTTA-17. (445977)

House of quality canned Meat, Pork, Sausages, Fish, Chicken etc

আপনার সহানুভূতি প্রার্থনা করে

এন. বি. মেডিকেল হল

ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রে

ডাঃ বোসের লেবরেটরি

রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি পরীক্ষা করা হ

নবব্যারাকপুর
ষ্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে

ফোন-৫৭-২৮৮৩

সম্পাদক—নিখিলেন্দু চক্রবর্তী ● প্রচ্ছদপট —অরুণ বণিক

শারদীয়া কিশলয় এর মেলা

P 27397

পরিচালনায় ঃ

কিশলয় সব পেয়েছির আসর

নব-বারাকপুর ঃঃ ২৪ পরগণা।

ফোন : ৫৫-৭৫৫

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা

১৩৮০ সালের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ

কবিগুরুর কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক

।। দা লি য়া ।।

যাত্রারূপ—নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ● নির্দেশনায় —অরুণ রায়

সুর—অনিল চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুনীর কাহিনী অবলম্বনে—

।। জীবন মরণ ।।

যাত্রারূপ—চণ্ডী ব্যানার্জ্জী ● নির্দেশনায়—জহর রায়

সুর—পঞ্চানন মিত্র

দুটি নাটকেই শ্রেষ্ঠাংশে—

শক্তি ভট্টাচার্য্য ● গীতশ্রী দেবী ● অজিত সাহা ● জয়ন্ত কুমার

নৃত্যে—মিস জে

সর্বাধিনায়ক, সহঃ পরিচালক, পরিচালক ও ম্যানেজার—

যথাক্রমে সত্যেন চক্রবর্ত্তী ● মুকুল কর ● চন্দন মিত্র ● মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা

১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

বহু প্রশংসিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত একত্রে দুটি একাঙ্ক রহস্য নাটক—

।। মাকড়সা ও নীলচশমা ।।

রচনা—**নাট্যকার নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী**

প্রকাশক—**প্রতিমা প্রকাশ ভবন**

৪৪, জগদীশ বসু রোড, নব বারাকপুর, ২৪ পরগণা

শারদীয়া অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য

বিদ্যার্থী কোচিং ক্লাস

যোগাযোগ করুন—**কিশলয় সব পেয়েছির আসর**

নব-বারাকপুর

॥ পূজা সঙ্কলন ॥

কিশলয়

এর

মেলা

রেজিঃ নং—
আর. এন. ১৮৪৯০/৭১

ভাদ্র ও আশ্বিন

বর্ষ—৩ ● ১৩৮০ ● সংখ্যা—১৭

পত্রিকা পরিষদ

সভাপতি— শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক— নিখিলেন্দু চক্রবর্ত্তী
বার্তা ও ধাঁধাঁর আসর বিভাগীয় সম্পাদক „ শ্যামল কুমার বসু
বিজ্ঞাপন সম্পাদক— „ প্রশান্ত রায়
বিজ্ঞান বিভাগীয় সম্পাদক সুজিত চৌধুরী
প্রকাশক পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী
সাধারণ সভ্য— শ্রীসুনীল চক্রবর্ত্তী (আসর-সভাপতি)
শ্রীকমলা রঞ্জন বিশ্বাস (সংঘমিত্র) তড়িৎকান্তি রায়
(সহঃ-সংঘমিত্র) ও অনাদি মুখার্জী

Space donated by :—

H. K. BASU & CO.

Undertake Rubber and Plastic Moulding Jobs Suppliers.

Branch Office

28, RAMKAMAL SEN LANE,

CALCUTTA-7.

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	সম্পাদক
প্রসঙ্গ ঃ	
কিশলয় প্রসঙ্গে	কমলা রঞ্জন বিশ্বাস
ধাঁধাঁর আসর	শ্যামল বসু
৪। আসর সংবাদ	

কিশলয় এর ভাইবোনেরা ঃ

খাঁচায় বন্দী ময়না	দীপক ভৌমিক
ব্যাঙের পাখী শিকার	মৌসুমী চক্রবর্ত্তী
পাখী	উৎপল চক্রবর্ত্তী
আসর শিবির	অলোক চৌধুরী
সোনামণি	চঞ্চল চক্রবর্ত্তী
ঘন্টাদা বনাম ফন্টাদা	ভবপ্রোধ বিশ্বাস

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুণ ঃ

উৎসবে ● আনন্দে ● নিত্যপ্রয়োজনে

হা ল ফি ল

ব্রাউজ, ব্রাউজপিস, ব্রেসিয়ার, সায়া, মোজা, গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, প্রভৃতির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

নব বারাকপুর, পুরাতন বাজার, (দক্ষিণে), ২৪ পরগণা

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গল্প

ভৌতিক ঘড়ি	তপন কুমার চৌধুরী
হুহু চাচা	ঙড়িং কান্তি রায়
নিন্টির পুতুল	সুবন্ধু সুর
বাঘ শিকার	সুনীল মুখোপাধ্যায়
দুর্ঘটনা	অলোক চট্টোপাধ্যায়
বিপুল সমারোহ	শ্রীমান

কবিতা

সোনা সোনা শরতে	মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী
দূর পথ ডাকছে	শান্তশীল দাস
মা আসিছে	শেখর মিত্র
আমি যা দেখেছি	অনুপ কুমার দত্ত
শরতে বাঙলা	গোপাল দাস কাব্যভারতী
খেলার সাথী	গোপাল ভৌমিক

ছড়া

প্রজাপতির বিয়ে	নিখিল রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
সাধের ছড়া	সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী

With compliments from :—

Calcutta Food Processing Co.

27, METCALFE STREET.
CALCUTTA-13.

Makers of Pieper Brand Jam, Jelly, Vinegar & Cunned Meat & Spaghetti, Macaroni, Vermeiolli.

Office 23-6940 Factory : 46-0071

ঘটক পাড়ার দত্ত মশাই	সনাতন চক্রবর্ত্তী
হালুম হুলুম	পৃথীশ পত্রনবীশ
সোনার ছড়া	সরল দে

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

সুলী প্রুধোমা	সাতোলাল কর

সাক্ষাৎকার

অভিমুখের দর্পণে	অভিমুখ

বিজ্ঞান কণিকা :

জেনে রাখা ভাল	সুজিত চৌধুরী

আলোচনা :

মোপাসাঁ কথা প্রসঙ্গে	কালিদাস ভদ্র

কথিকা :

রামেন্দ্র সুন্দর	পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী

প্রবন্ধ :

রবীন্দ্র সঙ্গীতের উৎস সন্ধানে	ডাঃ সৌরেন্দ্র নারায়ণ বসু
রামমোহনের ছোটবেলা	স্বপন বুড়ো

নাটক :

কারাগারে অরবিন্দ	নরেশ চক্রবর্ত্তী

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :

● মা য়া রে ডি ও ●

নব বারাকপুর : ২৪ পরগণা।

সম্পাদকীয়

বর্ষ—৩
সংখ্যা—১৭
১৩৮০

শরতের আকাশ শুভ্র খণ্ড খণ্ড মেঘে নিজেকে এমন করে সাজিয়ে রাখে যেন কাননে ফুটে আছে গন্ধরাজ আর রজনীগন্ধা, দশভুজা নানা শক্তি শোভিত মায়ের আগমন বার্তা ঘোষিত হয় ঐ কারনের এক প্রান্ত থেকে। আবিভূতা জননীর পদতলে শত্রু বিমর্দিত, দক্ষিনে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিনী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান দায়িণী, সঙ্গে বল রূপি কার্তিকেয়, কার্য সিদ্ধি গণেশ ও বীরেন্দ্র কেশরী শত্রু নিপিড়নে নিযুক্ত। করো জোড়ে আমরা সবাই প্রণাম করি আবির্ভূতা জননীকে। জননীর এই শক্তিতেই আমরা অনুপ্রানিত হয়ে এগিয়ে চলেছি আমাদের কণ্টক ভরা চলার পথে। মহা অষ্টমির দিনে প্রতি বছর সবাই আমরা পূজার ডালি সাজিয়ে মহা সমারহে মায়ের পূজা সমাপণ করি। আমরা ভাই বোনেরাও "কিশলয় এর মেলা"কে সাজিয়ে তোলে নানান ফুলের রঙে। আমরা সবাই জননীকে প্রণাম করে বলি— সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে॥

এবারের "কিশলয় এর মেলা" ভাই-বোনের সবুজ লেখনীতে ফুটে ওঠা সাহিত্য নিয়ে, আপনাদের কাছে পৌছিয়ে দিতে পারছি এতে আমি বিশেষ ভাবে নিজেকে ধন্য মনে করি। ছোটদের উপযোগী ও ছোটদের সাহিত্য আপনাদের মনের কোণে সামান্যতম স্থান যদি অধিকার করে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হতে চলেছে মনে করবো।

আজ শারদীয়ায় পাঠকদের হাতে "কিশলয় এর মেলা" তুলে দিতে পারছি একমাত্র আমার সহযোগী কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সভাপতি, সংঘমিত্র ও পত্রিকা সভাপতির অমূল্য উপদেশ। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় শশাঙ্ক ভূষণ রায় মহাশয়ের অপরিসীম পরিশ্রমের কথা।

সবশেষে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা যাঁরা আমাদের সহযোগীতা করেছেন মূল্যবান লেখনী আর বিজ্ঞাপন দিয়ে। সকল পাঠকের আশীর্বাদ কামনা করে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শুঃ সঃ পেঃ আঃ

ঃ নিয়মাবলী ঃ

।। কিশলয় এর মেলা ।।

নব বারাকপুর অঞ্চলের একমাত্র শিশু ও কিশোর সাহিত্য
মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক—২·০০, ৩·৬০ (ডাক সহ)।
যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
লেখার সহিত ২০ পয়সা ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।
(গ্রাহক ব্যতীত)
যে কোন বিষয়ে যোগাযোগের জন্য ডাক টিকিট প্রয়োজন।
লেখা মনোনীত হইলে প্রকাশ করা হয়।
অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
শিশু ও কিশোরদের উপযোগী লেখা গ্রহণ করা হয়।
চিঠিপত্র ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—
সম্পাদক—নিখিলেন্দু চক্রবর্ত্তী
৪৪, জগদীশ বসু রোড, পোঃ—নব বারাকপুর, ২৪ পরগণা

কবিতা — সোনা সোনা শরতে

মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী

সোনা সোনা শরতে
কি যে শোভা মরতে
কত হাসি সুর ঝরে
হৃদয়ের পরতে ॥

ঝল্‌মল্ নীলাকাশ
ওড়ে মেঘ ওড়ে হাঁস
শিশিরেতে উজ্জ্বল
কচি কচি দুব্বঘাস ॥

শিউলিরা ঝর্‌ঝর্
ঝরে সারা দিন ভর্
মৃদু বায় দূর বনে
দোলে পাতা পত্তর ॥

আকাশটা নীল নীল
রোদ্দুরে ঝিল্‌মিল্
নদী তীরে ওড়ে বক
মাছরাঙা আর চিল ॥

ঝির ঝির গেয়ে গান
নদী তোলে কলতান
সবুজ মাঠের রঙে
ভুলে মন ভুলে প্রাণ ॥

ঝুম্‌কোরা দুল্ দুল্
দোলে মাঠে কাশফুল
গরবী করবী হাসে
হাসে রাঙা জবা ফুল ॥

এলো মধু আশ্বিন
বুকে বুকে বাজে বীণ
দশভুজা মার পূজা
বাকী আর কদ্দিন ?

"দূর পথ ডাকছে"

শান্তশীল দাশ

যেতে হবে, যেতে হবে, আরো দূর যেতে হবে,
ঐ শোনো দূর পথ ডাকছে
কখনো নামছে জল, কখনো আলো উজল,
কখনো আঁধার পথ ঢাকছে।
সকল ভাবনা ভয়, কর কর কর জয়,
পথ হোক তোমাদের নির্বাধ ;
চল সম্মুখ পানে, পথ মুখরিত গানে
ক'রে তোলো মুছে ফেল অবসাদ।
চির আলোকের দেশে, চলার পথের শেষে
আসতেই হবে—সেই পথ নাও ;
কিশোর কিশোরী দল, চঞ্চল উজ্জ্বল,
নির্ভয়ে জীবনের গান গাও।

ঃ মা আসিছে ঃ

শেখর মিত্র

মায়ের বাজনা বাজিছে আজিকে
সবাই ছুটে আয়রে ভাই,
মিলন মেলায় মিলব মোরা
আজ কোন ভেদাভেদ নাই।

কে হিন্দু ? কে মুসলমান ?
কে জৈন ? কে খৃষ্টান ?
ওরে আমরা সবাই একই মায়ের সন্তান।
সোনালী আলো হাসিছে আজি
মাঠভরা শ্যামল ধানের শীষে,
মোদের জীবন উঠুক ভরে
মায়ের দেওয়া নব আশীষে।
কোয়েল দোয়েল পাখীর গানে
মন চলে যায় দূর গগনে
পাঠে যে আজ মন বসে না মন করে আনচান।
মেঘের ভেলা দিচ্ছে পাড়ি
এপার থেকে ওপারে,
আসছে আরো মেঘের ভেলা
এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে।
মায়ের বাজনা বাজায় কে-রে ?
নীল গগনে ঐ যে-রে
ছুটেছে ওরা এদিক ওদিক হয়ে আনমন।
আসিছে আজিকে মা যে
মোদের কাছে,
সব ভেদাভেদ আজি
রাখরে পাছে,
বরণ করিতে মাকে মোদের
এই ধরণীর ধূলায়।
আসিছে মা একটি বছর পরে
শুধু মাত্র তিনটি দিনের তরে
আয়রে সবাই গাইরে মায়ের আগমনী গান।

"আমি যা দেখেছি"

অনুপ কুমার দত্ত

একটা ফড়িং। সুতো দিয়ে বাঁধা ওর
ঠ্যাঙ্ দুটো, লম্বা এক টুকরো সুতোর অপর দিক
জানালার গরাদে।
'ফড়িংটাকে বাধলি কেন' ?
"—কেন, খেলবো বলে"।
ফড়িং কি একটা খেলার জিনিস !
আর তুই'ত এখন স্কুলে যাবি
ওটার ভুখ্ লাগবে না !
"—তুমি একটা বোকা হাবা,
ফড়িংএর কি খিদে পায়
ওকি একটা মানুষ যে খিদে পাবে।"
ঘটনাটা হয়ত কম বেশী সত্য,
পরিচিত অথবা অপরিচিত যাই হোক না
কেন, এর শেষ কোথায়।
সুতো দিয়ে বাঁধবার পর
বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করছিলো
উড়বার অভিপ্রায়ে। বাধাকে না মানবার ইচ্ছায়,
কিন্তু সব শক্তি কি তার !
বিকেলে, পশ্চিম আকাশে সূর্য।
হৈ হৈ করে ছুটে এল একদল ছেলে
জানলার গরাদে, তাদের নতুন

খেলার উপকরণ—ফড়িং
কিন্তু কোথায় সে !
এক কোণের দিকে পতঙ্গ বিহীন
পড়ে আছে সে—নির্জীব, স্থির, নিস্কম্প।
—"দূর এটা মরে গেছে চল চল
অন্য খেলা খেলি" চলে গেল ছেলেরা।
আর এই মুহূর্তে নিহত ফড়িংটাকে
ভাল করে দেখলাম, ওর ডানা দুটো খসে
গেছে গরাদে আঘাত খেয়ে খেয়ে।
অস্তমিত সূর্যের লাল আলো ওর গায়ে,
কোন অদৃশ্য হাত ওকে সাজিয়েছে
অপরূপ সাজে। মনে হল—
এই বিংশ শতাব্দীর শেষে আর একটা
'শহীদ'এর সংখ্যা বাড়ল।

ক্ষত বিক্ষত হয়েও স্মৃতিটুকু সম্বল করে আমরা বাঁচতে চাই। কিন্তু স্মৃতি কি অস্পষ্ট ? না—সেই অতীত স্মৃতি ভবিষ্যতে মূর্ত হয়ে ওঠে ছবির সাহায্যে

"ছবি ! সেতো ক্যামেরার চোখ"

তাহলে আসুন—

বিন্দু আর্ট ষ্টুডিও

নেতাজী সুভাষ রোড

নব বারাকপুর

"শরতে বাঙলা"

গোপালদাস কাব্যভারতী

শরৎ শেফালী আঙিনা ভরেছে
বাঙলার ঘরে ঘরে,
বাঙলার বধূ আলপনা দেয়
অঙ্গণ দ্বার পরে।
টগর দোপাটি হাসে মিটি মিটি
কুমুদ দিঘির জলে,
ভোরের শিশিরে দুর্ব্বা নেয়েছে
শুচি হবে আজ বলে।
আগমনী গান বাউল বেঁধেছে
সুরে বাজে একতারা,
নব নীলিমায় শরতের হাসি
উছল উজল ধারা।
সোনালী কিরণে সবুজ হেসেছে
মাঠে মাঠে ফলে সোনা,
এইতো আমার বাঙলা মায়ের
স্বরূপের চেনা শোনা।
বাঙলা আমার মরমের ভাষা
সে ভাষায় গাহি গান,
বাঙলার ছেলে বাঙলার মেয়ে
সেই সুরে তোল তান।

গল্প

ভৌতিক ঘড়ি

তপনকুমার চৌধুরী

এ বছর ক্লাস সিক্সে ফার্স্ট হ'য়ে উঠলো পল্টু। আর জেঠামশাইও তাঁর কথা রাখলেন। পল্টুকে দিলেন একটা ঝক্‌মকে নতুন ঘড়ি। পল্টুর আনন্দ তখন দেখে কে! আনন্দের অতিশয্যে ও ব'লে উঠলো—'জেঠামশাই, ঘড়িটা কোথাকার?'

জেঠামশাই হাসলেন। বললেন—'আমি যখন তিব্বতে গিয়েছিলাম, তখন এক রাশীয়ান টুরিষ্টএর সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে-ই আমাকে দিয়েছিলো ঘড়িটা। এতদিন বাক্সে তুলে রেখেছিলাম তোর জন্য।'

পল্টু জানে, জেঠামশাইয়ের জিনিস একমাত্র নেহাৎ ভাগ্যবানের বরাতেই জোটে। কারণ, জেঠামশাইয়ের দেশ বিদেশ ভ্রমণ করার বাতিকটা বড্ড বেশী। নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে সেসব দেশের সুন্দর সুন্দর জিনিস তিনি কিনে আনেন। স্বদেশের জিনিস-পত্তরে যেন তাঁর মন ভরে না! আর সেসব জিনিস দেখতেও জম্‌কালো! পল্টু তাই একবার ব'লে বসেছিলো—'জেঠামশাই, আমায় তো তুমি একটা কিছু দিলেনা কোনদিন!' জেঠামশাই বলেছিলেন—'দেবো রে দেবো! এবার পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড কর দেখি, তারপর দেখ্‌ কী দিই তোকে!'

ব্যস্! জোর পড়া-শোনা শুরু করে দিয়েছিলো পল্টু। যে পল্টু পরীক্ষায় কোনদিন ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি—সে-ও কিনা ফার্স্ট হ'য়ে গেল! আর তারপরেই বাগিয়ে ফেললো ঘড়িটা! উঃ, কী দারুণ ঘড়ি! প্রথম প্রথম তো স্কুলে যাওয়াই যেতো না ঘড়িটা প'রে—'হ্যাঁরে, কোথায় পেলিরে ঘড়িটা? ওরে দেখ, পল্টু একটা

দারুণ ঘড়ি পরেছে'—স্কুলের ছেলেরা ওকে অস্থির ক'রে তুলতো! কোন রকমে পালিয়ে বাঁচতো পল্টু। কিন্তু পল্টু কি জানতো, এটা একটা ভৌতিক ঘড়ি! আর এই ঘড়ি নিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে··

জেঠামশাই তখন বাড়িতে নেই। আবার দেশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছেন। বাড়িতে কেবল পল্টু, পল্টুর বাবা আর মা। জেঠামশাইয়ের ঘরে রাতে পল্টু একা শুয়ে আছে। ওর মাথার কাছের টেবিলে ঘড়িটা। ঘড়ির রেডিয়ামের আলো অন্ধকার ঘরটাকে আলোকিত করে দিয়েছে। যতক্ষণ ঘুম না আসে ঘড়িটার দিকে একভাবে তাকিয়েছিলো পল্টু—হঠাৎ একি! ঘরে ওটা কে এসে—দাঁড়িয়েছে? ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সলো পল্টু! মশারী তুলে ভালো ক'রে তাকালো। তার মনের ভুলও তো হ'তে পারে! কিন্তু না তো! সত্যিই তো একটা লোক! একটা ইংরেজ ভদ্রলোক! অদ্ভুত সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে! ফর্সা গায়ের রঙ মাথা ভর্তি বাদামী চুল! পল্টুর সারা দেহ মুহূর্তে ঘামে ভিজে উঠলো! অবাক চোখে ও দেখে যাচ্ছে পরের ঘটনাগুলো। ইংরেজ ভদ্রলোক কয়েক পা এগিয়ে এলো। কী লম্বা চেহারা! ধীরে ধীরে পল্টুর দিকে তাকালো। বললো—'উঃ, আজ এতদিনে তোমাকে একা পাওয়া গেল'! ভদ্রলোকের কথাগুলোতে ইংরেজী-বাংলা মেশানো। তবুও পল্টুর বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছিলো না! কিন্তু ওর ভীষণ ভয় করতে লাগলো! এখন একা পেয়ে ভদ্রলোক তাকে কি করবে? তাকে কী পল্টু আর ভাবতে পারে না! চেঁচাবে যে, সে শক্তিও নেই! ভদ্রলোক বলে চলেছে—'কী? ভয় পাচ্ছো আমায় দেখে? ভয়ের কিছু নেই! আমি কেবল তোমার এই ঘড়িটা নিয়েই চলে যাবো'!—'কেন?' হঠাৎ মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল পল্টুর। ওর এত আদরের জিনিসটা কেনই বা নেবে ভদ্রলোক! ভদ্রলোক হাসলো। বললো—'বাঃরে!

আমার ঘড়ি আমি নেবো না!' 'তোমার ঘড়ি মানে?'—পল্টু মরীয়া হ'য়ে কথাগুলো বললো—'এটা তো আমায় জেঠামশাই দিয়েছেন'। 'হ্যাঁ, তা দিয়েছেন বটে'—ইংরেজ ভদ্রলোক বললো—'কিন্তু তোমার জেঠামশাই ঘড়িটা পেলেন কার কাছ থেকে তা' জানো? পেয়েছেন এক গুণ্ডার কাছ থেকে! যার নাম পিটার। পিটারের কাজ রাশিয়ার রেললাইনে-রেললাইনে 'স্যাবোটেজ' ঘটানো! অর্থাৎ রেল লাইনের ফিস্‌প্লেট খুলে দিয়ে রেলে দুর্ঘটনা ঘটানো! তারপর দুর্ঘটনা ঘটে গেলে আহত বা নিহত ব্যক্তিদের জিনিস পত্তর নিয়ে চম্পট দেওয়া! এ পর্য্যন্ত পিটার রাশিয়ায় ছয়টা 'স্যাবোটেজে'র সাথে যুক্ত আছে! এই পিটারের কাছ থেকেই তোমার জেঠামশাই পেয়েছেন ঘড়িটা! অবশ্য পিটার বাধ্য হয়েই তোমার জেঠামশাইকে দিয়েছে! এমন ভালো ঘড়ি বিনা কারণে কে-ই বা হাতছাড়া করতে চায় বলো?'

ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো পল্টুর! ভয়ের কথা ভুলে গিয়ে ও ব'লে উঠলো—'কেন, পিটার জেঠামশাইকে কেন দিলো ঘড়িটা?'

ভদ্রলোকের চোখ দুটো চক্‌চক্ ক'রে উঠলো। বললো—'ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি শোনো! ১৯৬৮ সালের ১২ই নভেম্বর। রাতের স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে একটা মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। আমিও সেই ট্রেনের যাত্রী। চলেছিলাম রাশিয়ারই কোন এক জায়গায় ব্যবসায়ীক কাজে! হঠাৎ স্যাবোটেজের কবলে পড়ে মেল ট্রেনটা লাইনচ্যুত হ'য়ে উল্টে গিয়ে পড়লো ঢালু জমিতে! যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিলো, শুনলাম আর্তচিৎকারে চারিদিক ভ'রে উঠেছে! তারপর একসময় মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়লাম!'—ভদ্রলোক একবার থেমে আবার বললো—'ভয় পেওনা, বা অবাক হ'য়ো না! ঘটনাটা শুনে যাও.....তারপর দেখলাম সেই পিটার এসে আমার হাত থেকে বহুমূল্য ঘড়িটা খুলে

নিলো ! ঘড়িটা আমার বড় সখের জিনিস ছিল ! মনে মনে ভাবলাম—এই ঘড়ি কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না ! আমি পিটারের পিছু নিলাম ! সবসময় ওর সাথে সাথে থাকতাম। একেক সময় অস্থির হ'য়ে বলে উঠতাম—"পিটার, আমার ঘড়িটা দিয়ে দাও ! আমার ঘড়িটা দিয়ে দাও পিটার !" আমার কথা শুনে পিটার ভয়ে কানে আঙুল দিতো ! একদিন রাগে ওর গলাও চেপে ধরতে গিয়েছিলাম—কিন্তু পারিনি ! তারপর পিটার ঘড়িটা নিয়ে তেমন সুবিধে করতে পারে না। শেষের দিকে ওর অবস্থা এমন করেছিলাম, যে ঘড়িটাকে ও বিদেয় করতে পারলে বাঁচে ! এবং বিদেয় ক'রলোও একদিন ! তিব্বতে বেড়াতে গিয়ে তোমার জেঠমশাইয়ের সাথে পরিচয় হয় পিটারের ! পিটার তোমার জেঠামশাইকে দিয়ে দেয় ঘড়িটা। তোমার জেঠামশাই অনেকদিন আমার ঘড়িটাকে বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিলেন। আমিও আগলে রেখেছিলাম ঘড়িটাকে ! এবার তো ঘড়িটা তোমার হেফাজতে, তুমি আমায় দিয়ে দাও ঘড়িটা'—

পল্টু একভাবে তাকিয়েছিলো ভদ্রলোকের দিকে ! ওর সারা শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ! বললো—'নিয়ে যাও ঘড়িটা' !

আবার যেন হেসে উঠলো ভদ্রলোক। অসহ্য সে হাসি। ধীরে ধীরে ঘড়িটা হাতে তুলে নিলো সেই ইংরেজ ভদ্রলোক। তারপর হঠাৎ মিলিয়ে গেলো ! পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠলো পল্টু ! পাশের ঘর থেকে ওর বাবা-মা ছুটে এলেন ! বললেন—'হ্যাঁরে, কী হয়েছে ? ও পল্টু ?'

পল্টুর সারা দেহ কাঁপছে ! বাবা আদর করতে করতে মাকে বললেন—'কতদিন বলেছি, ওকে একা শুতে দিও না ! তা' তুমি কিছুতেই শুনবে না !'

পল্টু দেখলো, টেবিলে ঘড়িটা ঠিকই আছে ! তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিলো ? উঁহু ! এতো স্বপ্ন নয়, এতো সবই সত্যি ঘটনা ! প্রথমেই পল্টু বললো—'এ ঘড়ি আর আমি কিছুতেই পরবো না ! এখুনি ফেলে দাও এ ঘড়ি এখুনি !'

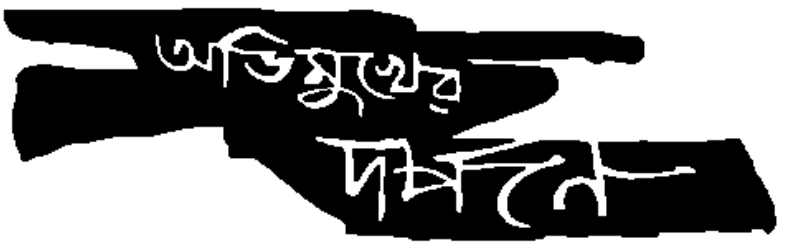

।। কণ্ঠই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

পিন্টু ভট্টাচার্য্য—

কবি কথায় ঃ—গান আর ফুলকে যে ভালবাসে না মানুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়নি তাইতো জীবনের একমাত্র ব্রত নিয়ে গানকে ধরে রেখে অপূর্ব দরদী কণ্ঠ পিন্টু ভট্টাচার্য্য সঙ্গীত প্রবেশ করলেন। কলকাতায় জন্ম হয়ে তিনি যেন স্বর্গ পেয়েছেন—। তার কারণ কলকাতার মত এত দরদী দর্শক সাধারণত আর কোথাও চোখে পড়ে না। তাইতো ছুটে গেলেন কিশোর বয়সে নীলরতন চ্যাটার্জীর কাছে। সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হল। তারপরে এলেন প্রখ্যাত গায়ক মনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য-এর কাছে এখনও তিনি শিক্ষার্থী—গান শেখেন পেয়ারে) উষারঞ্জন মুখার্জী কাছে আজ সঙ্গীত আসর উচ্চমার্গে, তার মূলে বন্ধু বান্ধব সুরকার শৈলেন মুখার্জী, আর মায়ের কথা বার বার স্মরণ করেন প্রত্যেক শিল্পীরই স্বীকৃতি লাভে বন্ধু বান্ধবের প্রেরণা সবচেয়ে বেশী কাজ দেয় এ কথাও স্বীকার করেন। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চর্চা চলতে থাকে। কালীঘাট অঞ্চলের ফরওয়ার্ড ক্লাবের বিচিত্রানুষ্ঠানে প্রথম দর্শকদের সামনে গান গাইবার সুযোগ লাভ করেন বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীর পরে রাত ২-৩০ মিঃ সময় সমিতির চুক্তি অনুযায়ী একটা গান গাইবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি একটি গান গেয়েই মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে হৈ-হৈ, রৈ-রৈ চিৎকার—আরও গান গাইতে দিতে হবে—দিতে হবে। সমিতির উপরে হামলা হল! তখন তিনি সহাস্যে

P29397

বললেন—এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এ পুরস্কার আমি চিরদিন শিরধার্য্য করে রাখব।

১৯৬৩ সালের কথা! প্রতিটি ব্যক্তির মুখে মুখে দুটি গান ভেসে বেড়াতো—"যে গান শোনাতে আসি" আর আকাশ কি নীল নীল।" এই দুটি গান গেয়েই রেকর্ড কম্পানিতে প্রবেশ করলেন ১৯৬৩ সালে। এবারের পূজাসংখ্যা নচিকেতা ঘোষের সুরে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় গান দুটি জোর গলায় বলতে পারি শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখবেই রাখবে। ছায়াচিত্রে কণ্ঠদান করা একমাত্র প্রচারভিত্তিক পথ। স্বীকৃতিলাভে জনসাধারণই সবার অগ্রে। প্রথম তিনি কণ্ঠদান করেন "পান্না-হীরা-চুন্নী" ছবিতে শ্যামল মিত্রের সঙ্গে। তারপর থেকে একের পর এক ছায়াচিত্রে কণ্ঠদান করতে অনুরোধ আসে। তাঁর আগামী ছবি "দাবী" "বিকেলে ভোরের ফুল" প্রভৃতি চিত্রগুলি। এটাও কৃতিত্বের কথা যে একজন বাঙালী শিল্পী হয়ে অসমীয়া ছবিতেও কণ্ঠদান করে প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেছেন। এটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের কথা।

সঙ্গীতশিল্পী

রুচিসম্মত যে কোন গান, কি ভারতীয়, কি পাশ্চাত্য আমার মনকে জয় করতে পারে। শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য উন্নততর শিল্প তৈরী করা—সংস্কৃতিকে তুলে ধরা—শ্রোতাকে আনন্দদান করা। পশ্চিম বাংলা আমার জন্মভূমি—মাতৃসম। তাই যেখান থেকে ডাক আসে তখনই ছুটে যাই সঙ্গীত পরিবেশনে! প্রশ্ন করতেই তিনি বল্লেন—নিজের গাওয়া প্রত্যেকটি গান আমার কাছে প্রিয়। তবু কণ্ঠ কি বাঁধ বাধে? তাইতো সুর ভেসে আসে "শেষ দেখা সেই রাতে।" তারপরে সহাস্যে বললেন সঙ্গীতই আমার প্রাণ—আমার জীবন বেদ। আপনার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কে? বলতেই বললেন—অতীত দিনের সুধীরলাল চ্যাটার্জী আর বর্তমানে আমার মন কেড়ে নিয়েছেন লতা মঙ্গেশকার। আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলতেই বলে উঠলেন—কণ্ঠই আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আমরা

শারদীয়া

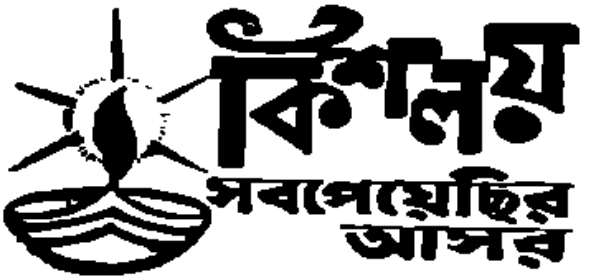

১৩৮০

ভাই বোনেরা

কবিতা

"খাঁচায় বন্দী ময়না"

দীপক ভৌমিক

ময়না যখন বন্দী খাঁচায়
ইচ্ছা করে তার—
কেউ যদি এনে দেয়
এক ছড়া হার
এছাড়াও আরো ইচ্ছা—
আছে মনে—
কেউ যদি এসে তার
খাঁচা দেয় খুলে।
তবে সে ঘোরে নীল আকাশে
মনের আনন্দে।
তার সব ইচ্ছা কেবল
রয়ে যায় মনে।
কেউতো আসে না কাছে
ছেড়ে দিতে তারে।
উড়তে পারে না শেষে
খাঁচায় বন্দী থাকে

গল্প

ঃ ব্যাঙের পাখী শিকার ঃ

মৌসুমী চক্রবর্তী

আমাদের বাড়ীর সঙ্গে লাগানো একটি সব্জীর বাগান। সেই বাগান আমার বাবা নিজে হাতে করেছেন। সারা দিন অফিস করে সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরে তার সাধের বাগানে কাজ করেন। আবার সকালের দিকে তার ব্যাতিক্রম হয় না। আমাদের সেই সব্জীর বাগানে সেদিন যে কাণ্ড হয়েছিল তারই কথা বলছি। আজ থেকে ১ বছর আগের কথা বাবা তাঁর বাগানে কাজ করছিলেন, তার পাশের বাগানটা ছিল ডাটা গাছের, তাই বাগানে ডাটার বীজ পড়ে ছিল। সেই খানে প্রতিদিন কিছুনা কিছু চড়াই পাখীর আনা-গোনা হতো। সেই দিন সকাল বেলাতেই এক ঝাক চড়াই পাখী সেই বীজ গুলো খাচ্ছিল, সেই সময় একটা ব্যাঙ পাশের নালা হতে উঠে পাশের ঝোপে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ব্যাঙ মশাইকে কিন্তু কেউই দেখেনি, চড়াই পাখীর দল বেশ আনন্দ করছিল। আর ওঁদিকে ব্যাঙ মশাই তার লক্ষ স্থির করছিল। তার পরই দে লাফ, লাফ দিয়ে চড়াই পাখীর ঝাকের উপর পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চড়াই পাখী তার মুখের মধ্যে। আর সেই হতভাগ্য চড়াই এর দল তাদের প্রীয় সঙ্গীকে হারিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আমার বাবা পিছন ফিরে তাকাতেই দেখেন এই অবাক কাণ্ড, তখন আমাদের সকলকে তিনি ডাকলেন। আমরা সকলে সেই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে ব্যাঙও পাখী খায় তারপর সেখানে আর অনেক বন্ধু বান্ধব জমে গেল। আমরা সকলেই দেখছিলাম কিন্তু

কেউ পাখীটাকে বাচানোর চেষ্টা করলাম না, কারণ ব্যাঙটা চড়াইটার মাথাটা প্রথমে গিলতে লাগল, পাখীটা বাচানোর চাইতে ব্যাঙের খাওয়া দেখতে ভাল লাগছিল তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যাঙটা পাখীর সর্বাঙ্গ নিজের উদরে পুরে ফেলল, আর আমরা অবাক দর্শক হয়ে কেবল তাকিয়েই থাকলাম, এমন অবাক কাণ্ড কেউ কোথাও দেখেছেন কি ?

ছড়া

।। পাখী ।।

ছোট্ট একটি পাখী
নামটি জান নাকি ?
নামটি তার টিয়ে,
মাথায় ঝুটি দিয়ে,
নাচে ঘুরে ফিরে,
চারি পাশে ঘিরে।

চুপটি করে থাচ্ছে ফল,
চোখটি নাড়ে টলমল।
গাছের ডালে গাচ্ছে গান,
ভোর বাতাসে অফুরনে
ঝোঁকলা দাঁতে দাদু হাসে,
ছোলার দানা ভালবাসে

ঘন্টাদা বনাম ফন্টাদা

ভবতোষ বিশ্বাস

পরের দিন মন্টু ঘোষ চ্যালেঞ্জ শীল্ডের ফাইনাল খেলা। খেলা হবে আমবাগান মাঠে। আগের দিন ঘন্টাদার আড্ডায় বসে তার দলের সব খেলোয়ারগণ ঘন্টাদার থেকে সলা পরামর্শ নিচ্ছে।

খেলা হবে ঘন্টাদার দল বনাম ফন্টাদার দল। ঘন্টাদার দলে কয়েক জন নামি দামি খেলোয়ার আছে। পল্টু নামে একজন খেলোয়ার আছে সে গত বছর বেষ্ট কাপ পেয়েছিল, সে এবারও এই দলে খুব ভাল খেলছে। তার পায়ের কাজ খুব সুন্দর, খুব জোরে ছুটতে পারে, তার দেহে খুব শক্তি আছে তার সবচেয়ে ভাল তার নিখুত সটগুলি। গতবার যে গোলটা দিয়ে ঘন্টাদার দল ফন্টাদার দলকে হারাল, সেই গোলটা করেছিল এই পল্টু। এই দলের অধিনায়ক নান্টু ও খুব ভাল খেলোয়ার সে স্টপারে খেলে, তার পায়ে এতজোর যে সে ব্যাক সট্ করার সময় এপার থেকে একেবারে অপর দিকের গোল পর্যন্ত পাঠিয়ে দিতে পারে আর এদের গোলকিপারত, গোলকিপার নয় যেন চম্বুক বল যেন আর গোলে ঢোকেনা। আরও কয়েকটা ভাল ভাল খেলোয়ার আছে এই দলে

অপর দিকে ফন্টাদার দলটাকেও এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল বলা চলে। কারণ তারা এ বছর প্রতিটি খেলায় খুব ভাল খেলেছে। ওদের দলের কয়েকটা ছেলে আছে যারা যুবক কিন্তু বেস অভিজ্ঞ, সু সাহসের অধিকারী এবং তাদের প্রচুর দম আছে। এদের আক্রমণ ভাগের খেলেয়ারদের থামান খুব কঠিন কারণ এদের পায়ের কাজ খুব ভাল, আর সবচেয়ে ভাল এই দলের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যোগাযোগ রাখা।

কিশলয়ের মেলা।

ঘণ্টাদাদের আলোচনা শেষ হলে ঘড়িতে এগারোটা বাজে মধ্যবয়স্ক বেঁটে মোটা দেহী ঘণ্টাদা আলোচনার শেষে পল্টুকে বললেন "বাবা পল্টু তুই যদি ওদের বিরুদ্ধে একটা গোল করতে পারিস তাহলে তোকে বেশী করে মাংস দেওয়া হবে, তোকে অন্তত পক্ষে একটা গোল দিতে হবেই

পল্টুদা বলল ঘণ্টাদা আমাকে একটু বেশী মাংস দিবেন ত ? তাহলে আমি একটা ক্যান্, দু দুইটা গোল দিতে পারুম্ ।

দ্যাখবেন কুনো ভাবনা নাই আমরা জিতুমই । আমাগো হারাইতে পারে কোন হালায় ।

নান্টু—ঘণ্টাদা আমরা জিতবই, আমরা সবদিক দিয়ে ওর থেকে ভাল ।

নকুল—ঘ্ ঘ্ ঘণ্টাদা ওরা জি-জি—জিতবে মানে, গো—গোল দিতে আসলে একেবারে হা-আ-আ আ-হাতপা ভে ভে ভোঁতা দেবো না ।

ঘণ্টাদা—তোরা জিততে পারলে আমি বাড়িতে মায়ের কাছে সত ঘোড়া বলি দেব ।

নানান কথাবার্তার পর যে যার বাড়িতে চলে গেল্ ।

পরদিন, ভোর হতেই ঘণ্টাদা দৌড়ালেন সোজা কালিঘাট সেখান থেকে বেলা এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন

বিকাল চারটায় খেলা হবে । দুপুর দেড়টা হতে না হতেই ঘণ্টাদার দলের খেলোয়াররা এসে তার বাড়িতে উপস্থিত হতে থাকল পাড়ার অনেক ছেলের দল । এসে ঘণ্টাদার জানালা প্রায় ভাঙে ।

ওদিকে ঘণ্টাদার ক্লাবঘরেও সাজ সাজ রব । ঘড়ির কাটায় তিনটা বাজতে না বাজতেই সমস্ত খেলোয়াররা তাদের পোষাক পরে নিল । তাদের জার্সির রং লাল-হলুদ । এত আনন্দের মধ্যে তাদের একটু দুঃখ ছিল যে তাদের একজন খেলোয়ার সকালে অসাবধানতা বসত

কলপাড়ে পড়ে গিয়ে কিছুটা জখম হয়েছিল
বেশ সুস্থ

দুটি দলই তিনটা তিরিশ মিনিটে মাঠে উপস্থিত হয়েছে দুই. দলই মাঠের বাইরে দুপাশে অনুশীলনে ব্যস্ত এবং তাদের ঘিরে অনেক দর্শক

সময় মত খেলা আরম্ভ হল চারিদিকে লোক আর ধরে না. তার উপর আশেপাশের গাছ গুলতে, এ বাড়ির প্রাচিরে ও বাড়ির ছাদে লোকে লোকারণ্য। খেলা আরম্ভ হতে না হতেই মাঠে উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চারিদিকে কি হয়, কি হয় ভাব। সবার মুখ বিকৃত কেউ কেউ পিছনে দাড়ায় পা এবং ঘাড় উচু করে দেখতে লাগল এক সময় পল্টু গোল দিয়ে দিচ্ছিল বলে. ঘন্টাদার দলের দুই জনকে কাটিয়ে গোলে সট দিতেই তৎপর গোল-কিপার ঘুষি দিয়ে বলটাকে গোলের পিছনে ফেলে নিজের দলকে বিপদমুক্ত করে গোলে সট করার পূর্ব মুহূর্তে পূর্বদিকের দর্শকদের সেকি উল্লাস দেখলে মনে হবে তারা যেন এক একটা পাগল। সট করার আগেই ওরা নিশ্চিত গোল বলে মনে করে উল্লাসে ফেটে পড়ে। এদিকের উল্লাস থামতে না থামতেই পশ্চিম দিকের উল্লাস বাড়ে। নন্টু বলে ঘন্টাদার দলের একজন ফরোয়ার্ড, দলের অপর একজনের দেওয়া বল খুব জোরে ভলি করলে দর্শকদের উল্লাসের অন্ত থাকে না। নন্টু কোথা থেকে নাচতে ছুটে এসে বলটাকে প্রচণ্ড জোরে মেরে একটা তাল গাছের সমান উচুতে তুলে মাঠের বাইরে ফেলল, দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। যাই হোক যে যাত্রায় নন্টুই একটি অবধারিত গোল বাচাল। বল মাঠে আসার সাথে সাথে আবার অপরদিকে উত্তেজনা ঘন্টাদাদের গোলের সামনে বল, ঘন্টাদের দলের একজনের পায়ে বল, সে বলটাকে পিছনে দাড়ান তাদের একজনকে দিল, সে আবার বা-দিকের পোস্টের সামনে দাড়ানো পল্টুকে দিতেই সে ডান পা দিয়ে এক-

জনকে কাটিয়েই সোজা গোলে সট, বল ডান পাশ থেকে বা পাশের পোস্টে লেগে কোণাকুণি ভাবে গোলে ঢুকে যায়। তারপর সারা মাঠে কি আনন্দ সবার মুখে একটা কথা গো—ল। পল্টুকে নিয়ে সে কি নাচানাচি এক সময় দেখা গেল পূব দিক দিয়ে একজন মোটা লোক দৌড়তে দৌড়তে আসছে সামনে এসেই ভিড়ের মধ্যে একজনের বগলের তলা দিয়ে সোজা পল্টুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—পল্টু বলল —ঘন্টাদা বেশী মাংস খাবে

—খাবি খাবি শুধু বেশী মাংস কেন তোকে একটা আস্তো পাঠা এনে দেবো। তুই আমাদের দলের মানকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে চলেছিস।

অপর দিকে আর একটি দৃশ্য। সেখানে একজন লোক হঠাৎ মূর্চ্ছা গেলেন। তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল সেবা করার জন্য। দলের পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তিনি মূর্চ্ছা গেছেন।

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ঘন্টাদা।

যাই হোক এই খেলায় শেষ পর্যন্ত ঘনটাদার দল পল্টুর দেওয়া ঐ এক গোলেই জিতে গেল। খেলার শেষে কি আনন্দ, সেই মোটা বেটে ঘন্টাদা তিনি দলের সবার আগে চললেন ধেঁই ধেঁই করে নাচতে নাচতে।

আগামী দিনের নাগরিক আজকের প্রতিটি শিশু। প্রত্যেক অভিভাবকের নজরে গড়ে ওঠে শিশুদের চরিত্র। তাই চাই প্রয়োজন শিশু প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন—

নব বারাকপুরের অন্যতম শিশু প্রতিষ্ঠান—

কিশলয় সব পেয়েছির আসর।

ঃ আসর-শিবির ঃ

অলোক চৌধুরী

শিবির শিবির শিবির সে কি আনন্দ শিবিরে না গেলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাইতো বার্ষিক শিবির থেকে এসে তোমাদের জন্য কলম নিয়ে লিখতে বোসলাম পড়ার টেবিলে

গত ১০মে থেকে ২৬মে পর্যন্ত মূলকেন্দ্রর পরিচালনায় রায়গঞ্জ দেবীনগর বার্ষিক শিক্ষা শিবিরের কথা বলছি। মূলকেন্দ্র আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিল যে ১৯শে মে হাওড়া ষ্টেশনে বড় ঘড়ির তলায় সব আসরকে জমা হতে তাই সবাই সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর ৮-৫০ মিঃ সময় ট্রেন এসে দাড়াল, আমাদের জন্য আগে থেকে দুটো বগি ঠিক ছিল তাই তাড়াহুড়ো কিছুই নেই সবাই আস্তে আস্তে গাড়ীতে উঠে যার যার জায়গায় বসে পড়লাম, ৯টার সময় ট্রেন ছেড়ে দিল তখন মনে পড়তে লাগল আসরের সোনার কাঠিদের কথা, ওদের ছেড়ে দিনের জন্য চলেছি, মনে একটা দুঃখ প্রকাশ হচ্ছিল কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, সব ভাই বোনের মাঝে নিজের দুঃখ যেন বিলীন হয়ে গেল। সে রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিলাম ২০মে সকাল ৯টার সময় মালদহ স্টেশনে এসে পৌছলাম তারপর ওখান কার খেয়ালী ও পিয়ালী দুই আসর মিলে আমাদের জন্য পুলিশ গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল তাই কোন অসুবিধে হয় নি দুপুর ১২টার সময় শিবিরে এসে হাজির হলাম। আমাদের সব আসর মিলে এক একটা দল তৈরী হল। আমাদের দলের নাম ছিল বিদ্যাসাগর যাহোক

একটু বিশ্রাম করে স্নান ও খাওয়া সেরে ঘুম বিকেল ৪টার সময় উঠে হাত মুখ ধুয়ে সাদা জামা, প্যান্ট, জুতো-মোজা ও স্কার্ফ পরে মাঠে এসে লাইন করে দাড়ালাম, তারপর বিকেল ৪-৩০ মি: মধ্যে পতকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ শিবির আরম্ভ হল এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কিছু কিছু করে আসর সম্বন্ধে বলে গেলেন। খুব ভাল লাগছিল কারণ আসর থেকে এই প্রথম আমি শিবির করতে এলাম আসর আমায় পাঠিয়াছে শিবির করতে তাই নিজেকে ধন্য মনে করি যাহোক সেই দিন আর কিছু হলনা তারপর পতকা নামিয়ে সমাপ্ত সঙ্গীত করে শেষ হল সে দিনের অনুষ্টান। ৬টার সময় টিফিন করে নিলাম এবং রাত্রে ৮টার সময় একটা অনুষ্টান হবে সে হচ্ছে সান্ধ্য মজলিস, এই অনুষ্টানে সব দল থেকেই অংশ গ্রহণ করতে পারে। কেও গান, নাচ, কেও বা নাটক করল এই ভাবে চলল আমাদের সান্ধ্য মজলিস সান্ধ্য অনুষ্টানের শেষে ১টার সময় খাওয়া সেরে দৈনিক কর্মসূচী নিজের ডাইরীতে লিখে নিলাম এই ডাইরী দেখে শিবির শেষে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই সুন্দর করে ডাইরী লেখার পর নিজের বিছানায় শরীরটাকে বিছিয়ে দিলাম।

দৈনিক কর্মসূচী : ভোর ৪টার সময় ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে সাদা জামা, জুতো, মোজা ও গেঞ্জি পরে মাঠে এসে দৌড়নোর পর লাইন করতে হত। তারপর পতকা উত্তোলন করে সংকল্প বাক্য পাঠ শেষে মূলকেন্দ্রের কর্মীরা যে যার লাইন করে নানা রকমের ড্রিল শিক্ষা দিতেন, তারপর ৮টা থেকে টিফিন ও একটু বিশ্রাম করে আসর পোষাক পরে ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সাধারণ প্যারেড এর পর ১১টা থেকে ১১-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত গান এবং ১১-৩০ মিঃ থেকে ১২ পর্য্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসার ক্লাস হত। ১২টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত স্নান, খাওয়া ও বিশ্রাম তারপর ১টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস এই ছাড়া বাঁশী, হাতের কাজ ও নানা রকমের

ক্লাস হত ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বিশ্রাম করে হাত মুখ ধু
ধুতি, গেঞ্জি ও লাল সালু পরে ৪-৩০ মধ্যে মাঠে
দাঁড়াতাম, মিঃ থেকে ৬টা পর্যন্ত ব্রতচারী শিক্ষা দেওয়া
হত, ৬টায় টিফিন করে ৮টায় সান্ধ্য মজলিসের জন্য
প্রস্তুতি নেওয়া হত, ৮টার সময় সান্ধ্য মজলিস হয়ে ৯টার সময়
খাওয়া সেরে দৈনিক কর্মসূচী ডাইরীতে লিখে···ঘুম, এর মধ্যে আরও
কতগুলি জিনিষ আছে প্রথম হচ্ছে—কোন কিছু চুরি ও কেও
শিবির থেকে বাইরে চলে না যায় সে জন্য পাহারার ব্যবস্থা
দ্বিতীয়—শিবিরে কেও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জন্য ডাক্তারের
ব্যবস্থা করা এইভাবে দৈনিক শিবির পরিচালিত হত

প্রয়োজন :—তোমরা যদি কেও কোন দিন কোন ধার্মিক শিবিরে
যাও তবে তোমাদের এই জিনিষগুলি প্রয়োজন—তিন জোড়া সাদা
জামা প্যান্ট, দুই জোড়া সাদা সুতো ও মোজা একজোড়া, গেঞ্জি,
একটি ধুতি ও একটি লাল সালু, তিনটি স্কার্ফ, (৫ ১) ফুট একটি
শতরঞ্জি, একটি বালিস, একটি বিছানার চাদর, গামছা, সুচ, সুতো,
কাঁচি, ছুরি, টর্চ, খাতা, পেন, একটি গ্লাস ও কলাই করা থালা ও মগ,
তেল, সাবান, আয়না, চিরুনি এছাড়া সাধারণ পরবার জন্য সাধারণ
জামা ও প্যান্ট, চটি, ব্রতচারীর কাটি ও বোনেদের সাজার জন্য
জিনিষ

মাসিক শিবিরে :—এক জোড়া সাদা জামা প্যান্ট, একজোড়া
সাদা মোজা, একটি গেঞ্জি, একটি স্কার্ফ, একটি ধুতি ও লাল সালু
(৫·১) ফুট একটি শতরঞ্জি, একটি বালিস, একটি বিছানার চাদর,
কলাই করা থালা ও মগ, সুতো, কাঁচি, ছুরি, চট্, খাতা-পেন
গামছা, আয়না, চিরুনি, গ্লাস, সাধারণ জামা-প্যান্ট ও বোনের জন্য
সাজার জিনিষ ও ব্রতচারীর কাটি লাগে।

মন খুব খারাপ কেননা আজই হল শিবিরের শেষ দিন তাই আজ

শেষ দিনে বিরাট করে একটা বিচিত্রা অনুষ্ঠান হল. এই অনুষ্ঠান চলল প্রায় রাত্র ১১টা পর্যান্ত। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পর দিন অর্থাৎ কলিকাতার আসার দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান করে তৈরী হয়ে নিলাম সংগে সংগে টিফিন করে নিলাম। ৮টার সময় সবাইকে এই শিবিরের একটা করে সম্মান পত্র দিল। আবার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দল ভাল কাজ করেছেন নিয়মিত নিয়ম মেনেছে সেই দল প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমরা 'বিদ্যাসাগর দল' প্রথম হয়েছি, তাই আমার খুব আনন্দ জীবনে প্রথম বার্ষিক শিবির করতে এসে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। আমি আশা করি, আমার আসরের প্রত্যেক সোনারকাঠি এই রকম বার্ষিক শিবিরে গিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আসরের সুনাম দিন দিন বাড়াবে।

॥ সোনামণি ॥

চঞ্চল চক্রবর্তী

সোনা মণি সোনা মণি,
করছো তুমি কি ?
ভাবছো বসে একলা ঘরে,
কি হয়েছে কি ?
এই দেখনা আমার হাতে
এনেছি লাল ফিতা।
তোমার মাথায় বেঁধে দিয়ে
করবো আমার মিতা

"খেলার সাথী"

গোপাল ভৌমিক

সবার সেরা পুতুল মনি
মিলবে না তার জুড়ি
তাই মাটিতে পা পড়ে না
দুই হাতে দেই তুড়ি।
মুখটি তার মিষ্টি যেমন
ঠোঁট দুটি লাল লাল
চোখ দু'টিতে নীল আকাশ
তুল তুলে দুই গাল।
চুলগুলি তার ঘন কালো
বুঝবে কে তা নকল
পরীর মত সাজিয়ে রাখা
নয়তো সোজা ধকল!

যারাই আসে পুতুল দেখে
চোখ করে গোল গোল
পিন্টু রিন্টু পটাশ রাশি
এগিয়ে দেবেই কোল।
আমার পুতুল সোনা মনি
যায় না কারই কোলে
হিংসুটে সব আমায় দোষী
বানায় তালে গোলে।
খোড়াই আমি কেয়ার করি
বেশ আছি এক টেরে
খেলার সাথী পুতুল সোনা
বেড়ায় তুড়ি মেরে!

———

নাটক

॥ কারাগারে অরবিন্দ ॥

নরেশ চক্রবর্তী

[অন্ধকারে—কথা—মাইক ঃ—গ্রেষ্টাট নবশক্তির অফিস থেকে লালবাজারে আনা হলো অরবিন্দকে ও অন্যান্য বন্দীদের। তারপর আনা হলো আলিপুর জেলে। আরম্ভ হলো, কুখ্যাত সেই আলিপুর বোমার মামলা, বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত, সত্যেন বসু, কানাই—লাল, হেমচন্দ্র, দেবব্রত, দীন দয়াল, নলিনী গুপ্ত, শচীন সেন, নরেন গোঁসাই প্রমুখ ৪৭ জন আসামীকে নিয়ে। বাংলার আকাশে বাতাসে তখন তাদেরই কথা……তারাই ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে যায়…জীবনের জয়গান ঃ—গান ভেসে আসে ঃ—

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারত বাসি।

আলোকের বিকাশ হলো……দেখা গেল……আসামীর বেশে অরবিন্দ আলিপুর জেলে তার সেলে পদ চারণা করছেন।]

অরবিন্দ—বন্দেমাতরম, জননী জন্মভূমি……তোমার শৃঙ্খল মোচনের পরম প্রয়াসে……তোমার সন্তানদের হাতে শৃঙ্খল পড়েছে, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, সত্যেন, কানাইলাল এরা মৃত্যুকে বরণ করে মাতৃঋণ শোধ করেছে। আমরা এখন বাকি, মামলা চলছে…… আলিপুর বোমার মামলা। কিন্তু হে নারায়ণ…হে বাসুদেব, আমার একি হলো? আমি ত ভেবেছিলাম, দেশের কাজ করতে আমাকে তুমি পাঠিয়েছ, তুমিই আমাকে রক্ষা করবে, কিন্তু কেন আমি এখানে এলাম……আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেন? [হটাৎ পরিবেশ পরিবর্তিত হয়……আলো স্তিমিত হয়ে এল। চারিদিকে

সুমধুর বংশীধ্বনি যেন শোনা যায়। অরবিন্দের সামনে অবির্ভূত হলেন শঙ্খচক্রধারী বাসুদেব মূর্তি···তিনি বলছেন···]

বাসুদেব অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়। তোমাকেত' আগেই বলেছিলাম ·····কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ কর, নির্জনে থাক, আমার কাছে এস, সে কথা তুমি ভুলে গেছ।

অরবিন্দ—না না সে কথা আমি ভুলিনি, তবু এ কথা বলবো, আমার কাজ ছিল—আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়, আমার অহংকারে আমি মনে করতাম—আমি না হলে সে কাজ হবে না, সবকিছু অচল হয়ে যাবে।

বাসুদেব—সে বন্ধন ছিন্ন করার শক্তি তোমার ছিল না কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং কখনও আমার অভিপ্রেত ছিল না যে তুমি এই কাজ নিয়েই থাকবে। তোমার জন্য আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং সেই জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দেবো। তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরী করে তুলব। এই নাও·····গীতা, গীতার সাধনা·· ···অনুশরণ কর। [বাসুদেব গীতা দিলেন অরবিন্দের হাতে]

অরবিন্দ—[গীতা অঞ্জলি পুটে নিয়ে]

জনামি ধর্ম্ম, ন চ মে প্রবৃত্তি,
জনাম্য ধর্ম্ম, ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া ঋষি কেষ, হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্ত-হস্মি তথা করোমি॥

আমি বুঝতে পেরেছি দয়াল, রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে।

বাসুদেব—ফলের আকাঙ্খা না রেখে কাজ করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। উচ্চ, নীচ, শত্রু-মিত্র, জয়—পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে। সে কাজের কোন শৈথিল্য করা চলবে না।

অরবিন্দ—বুঝেছি বাসুদেব·····এই···হিন্দু ধর্মের মর্মকথা।

বাসুদেব—হিন্দু ধর্ম্ম ··সেনাতন ··জীবনের ধর্ম্ম, মানুষের ধর্ম্ম। এ শুধু বিশ্বাসের বস্তু নয়, জীবন রসময় করে তোলবার পরম সম্পদ, এরই জন্যে ভারত উঠেছে। মানব জাতির মুক্তির জন্য, কল্যানের জন্য·····এই সনাতন জ্যোতি, সে জগৎ মাঝে বিকিরণ করবে।

অরবিন্দ—প্রভু কৃপাময়···এ আমি কি দেখছি? এ আমি কি শুনছি?

বাসুদেব—ভারত নিজের জন্য উঠছে না। অথবা যখন সে উঠবে, শক্তিমান হবে, তখন দুর্বলকে পদদলিত করতে সে উঠবে না ভারত চিরদিনই মানব জাতির জন্য, জীবন যাপন করেছে। নিজের জন্য নয়। আর তাকে যে বড় হতে হবে, তাও তার জন্য নয়, মানব জাতির জন্য। একবার চেয়ে দেখো তো আমার দিকে।

অরবিন্দ—কোথায়, কোথায় তুমি বাসুদেব। এ কি—আমি কোথায়? আমার চারপাশে তো জেলের প্রাচীর নেই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের গারদে দাঁড়িয়ে কে আমাকে পাহারা দিচ্ছে ··নারায়ণ তুমি নিজে? এ কি···? এ কি···? ওই চোর জুয়াচোর, খুনী ডাকাত, ওদের মধ্যেও তুমি?

বাসুদেব—হ্যাঁ, ওই সব লোকের মধ্যেও আমি আছি। এই সব লোকের মধ্যে তোমাকে পাঠিয়েছি···আমার কাজ করতে হবে বলে। যে জাতিকে আমি তুলতে চাই, এই তাদের স্বরূপ। এই জন্যেই তাদের তুলতে চাই।

অরবিন্দ—হ্যাঁ···হ্যাঁ···এই যে ডাকাতির অভিযোগে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে ওই লোকটার···ওত ডাকাত নয়, ও যে নিরপরাধ নিরক্ষর চাষী···সৎ···মানুষ।

বাসুদেব—মিথ্যা শ্রেণীর গর্বে যাদের তোমরা ছোটলোক বল, ঘৃণা কর, ও তাদেরই একজন। এদের নিয়েই আমার কাজ, তোমায় করতে হবে। আমি রয়েছি সকল মানুষের মধ্যে। আমিই তাদের

সকল কর্ম, সকল কথা নিজের ইচ্ছা মত পরিচালিত করি। আমি এখন তোমাকে রক্ষা করছি···। এখন তোমার ভয় আছে ? কোন সংশয় আছে ?

অরবিন্দ— না কোন ভয় নেই·· কোন সংশয় নেই।

বাসুদেব— এই যে তোমার বিরুদ্ধে এই মোকর্দ্দমা আনা হয়েছে, এটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। এ তোমার জন্য নয়। এই বিচারের জন্য আমি তোমাকে এখানে আনিনি। অন্য কিছুর জন্য এনেছি। মোকদ্দমা আমার কাজের একটা উপায় মাত্র···তার বেশী আর কিছুই নয়।

অরবিন্দ নারায়ণ·····বাসুদেব

বাসুদেব—তোমার পায়ে যে জাল জড়ানো আছে তা থেকে মুক্ত করবে তোমাকে একটা মানুষ। তোমার পক্ষ থেকে তাকে কিছু বলতে হবে না। তাকে উপদেশ দেবো আমি।

[মাইকে কথা ভেসে আসে

হরে মুরারে মধু কৈটভ হারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরুত্রায়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

অরবিন্দ—বাসুদেব···বাসুদেব···ওরা···ওরা···কারা ?

বাসুদেব—অমিত শক্তির আধার···ওরা তরুণের দল। ওদের আত্মত্যাগের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রখর বুদ্ধি···এক মহাশক্তি—শালী জাতি রচনা করেছে। ওরা অনেক বড়···তোমার কার্যের উত্তর সুরী ওরা। আমার ইচ্ছাতেই এরা উঠেছে··· আমি যা ঘটাতে পারি···কোন মানবীয় শক্তি তা পারে না।

[বাসুদেবের অন্তর্ধান]

[বাসুদেব অন্তর্ধান হতে, অরবিন্দ হাত ধ
মাইকে ভেসে আসে—]

[মাইক —

হরে মুরারে মধু কৈটভ হারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

[ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়]

সব রকমের আর
সব চাইতে ভাল
মিষ্টি যদি চান তবে
আসুন—
প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা
শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
নব-বারাকপুর বাজার
নব-বারাকপুর
প্রোঃ—তারাপদ ঘোষ।

"হু হু চা চা"

তড়িৎ কান্তি রায়

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। দুই বাংলার বহু আকাঙ্খিত যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন মাত্র চালু হয়েছে। আমাদেরও জনৈক আত্মীয় সে সময়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। কয়েক দিন পরে তার একটি চিঠি পেলাম। দীর্ঘ চিঠি। স্বাধীনতা প্রাপ্ত শিশু রাষ্ট্রের বাস্তব পরিস্থিতি, বৈষয়িক প্রসঙ্গ, পাক-হানাদার এবং তাদের তাঁবেদার বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার, সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি···। পড়তে পড়তে চিঠির একটা অংশে এসে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। তিনি লিখেছেন "অজু মিঞা আর নেই। গাঁয়ের লোক আমায় জানিয়েছে, একপাল হামলা-রাজের কবল থেকে একটি মাত্র দা সম্বল করে দুটি শিশুকে সে ছিনিয়ে আনতে গিয়েছিল। হিসাব করলে তার বয়স ষাট-বাষট্টির কম হবার নয়। স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। একে আত্মাহুতি ছাড়া কি-ই বা বলব!" আর কিছুই পড়তে পারলাম না। সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেল; শুধু মনে হল, চোখ দু'টিতে কে যেন মুঠো মুঠো লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে গেল।

• • •

স্মৃতির পর্দা ধীরে ধীরে খুলতে লাগল জরাসন্ধের মত দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত তখন সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে। আমাদের বাড়ী

ছিল ওপার বাংলার একটি গাঁয়ে। কবে থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ছুটু চাচার যোগাযোগ, আমার তা জানা নেই। সবে জ্ঞান হয়েছে কি হয়নি, তখন থেকেই দেখে এসেছি, প্রতিদিন সকালে এক ঘটি দুধ নিয়ে এসে তিনি হাঁক দিতেন, "কৈ গো চাচী, দুধ রাখেন, আর বাজানেরে (বাপজান) দিয়া জান।" চিরাচরিত ভাবে তখন রাখা হতো রোজের দুধ, যা কেউ কোন দিন ওজন করে দেখার কথা ভাবেনি। সহজাত বুদ্ধিতে সবাই জানতো এর মধ্যে অন্ততঃ আধ-সেরের মত ছিল ফাউ—যা' নিয়মিত ভাবে ছুটু চাচা পরিবেশন করতেন তাঁর বাজানকে। আর আমাকে দেওয়া হতো ছুটু চাচার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁর কাঁধে চেপে গ্রাম পরিদর্শনে বেড়িয়ে পরতাম। প্রকৃত পক্ষে আমার পরিজনেরা শৈশবে আমার নষ্টামীর হাত থেকে ঐ সময়টুকুতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচতো; কেননা তারা জানতো অন্ততঃ ঘণ্টা খানেকের আগে ছুটু চাচা আমাকে তাদের কাছে ফেরৎ দেবেন না। কোন কোন দিন আমার ঠাকুরমাকে অগত্যা বলতে হতো,—"হারে অজু, তোর বাজানেরে লইয়া থাকলেই প্যাট ভরব? ব্যালা কি কম হইছে,—কাম-কাইজে যাইবি না?"

মনের আয়নায় ছুটু চাচা যেন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠলেন। আমার শিশু সুলভ উচ্চারণ দুষ্টতার জন্যই হোক কিংবা দুধ দেওয়ার জন্যই হোক কেমন করে অজু মিঞা আমার কাছে ছুটু চাচা হয়ে গিয়েছিলেন আজ তা হলপ করে বলতে পারি না। পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু আমার ছুটু চাচা আর কোন দিনই আমার কাছে অজুচাচা হয়ে উঠতে পারেননি। কেন জানি না, আমার চোখে ছুটু চাচা যেন ছিলেন সকলের থেকে ব্যতিক্রম।

আমাদের গাঁয়ের মধ্যে বা খুব কাছাকাছি কোন হাট-বাজার ছিল না। প্রতি রবি এবং শুক্রবার প্রায় আড়াই মাইল দূরে হাট বসতো। তাঁর নিজের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ব্যতিরেকে আমাদের জন্যও ছুটু চাচাকে বাজার করতে হতো। আমাদের

সংসার নেহাৎ ছোট ছিল না, ফলে সপ্তাহের আবশ্যকীয় সামগ্রীর ওজন গুরুভারই হতো। এ দায়িত্ব কবে থেকে তাঁর উপরে বর্তে ছিল, আমার জানা নেই। কিন্তু এই বিনা-স্বার্থের বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমসাধ্য কাজ ছুটু চাচার কাছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হতো। ব্যাক্তিগত ভাবে তাঁর নিজের কিংবা আমাদের বাড়ীর লোকের অসাবধানতার ফলে কোন অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ না আনা হলে, এমনও হতো যে ছুটু চাচাকে সব আনা মোট ফেলেই আবার হাটে দৌড়াতে হতো। তবু তাঁকে অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। মনে পড়ে, আমার বাবা-কাকা ব্যবসায় উপলক্ষে শহরে প্রবাসী—ছিলেন। মাঝে-মাঝে তাঁরা বাড়ী আসতেন, কিন্তু কদাচিৎ তাঁদের হাটে যেতে দেখেছি।

এ মুহূর্তে মনে কত কথা, কত না স্মৃতির ভীড়। মনে পড়ে সেই সব হিংসা-বিদ্বেষ আর অনশ্চিয়তায় ভরা দিনগুলির কথা। বাড়ীর আনাচে-কানাচে পরিচিতদের মধ্যে কানাকানি ফিস্‌ফিসানি আর চোখে-মুখে ফুটে ওঠা চাপা আতঙ্কের মাধ্যমে সেই বয়সেও সবটা না হোক অন্ততঃ কিছুকটা বুঝতে পারতাম। টের পেয়েছিলাম বাঙালী হওয়া সত্বেও তখনকার ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের জীবন সম্পদ আর ধর্ম,—এদের কোনটাই নিরাপদ ছিল না। এদিক ওদিক থেকে মাঝে মাঝে আসতো মর্মান্তিক খবরাখবর। সবটাই ঘটনা না হোক পুরোপরি রটনাও ছিল না। কিছু কিছু সংখ্যালঘু পরিবারকে চিরতরে তাদের ভিটে-মাটি ছাড়তে দেখলাম; এমন পরিবারেরও সন্ধান পেয়েছিলাম যেন পা বাড়িয়েই রয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের মানবিক আর স্নায়বিক অবস্থা তখন খুবই নিম্ন-গামী। সে সময়ে আমার ছুটু চাচাকে দেখলাম আরেক রূপে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আহার-নিদ্রা, বাড়ী-ঘর সব ছেড়ে তিনি যেন আমাদের গ্রামেই কাটাতে লাগলেন। ভীত বিহ্বল মানুষগুলিকে

তিনি উৎসাহ আর সাহসের দম দিলেন। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বল্‌লেন "দেইখা সমু আমাগ জান থাকতে কাডায় আপনাগ / তোমাগ গায়ে হাত ছায়।"

আরও কিছুকাল পরের কথা। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেছি। স্থির হলো উচ্চতর বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আমাকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শুনেই বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল। এ-কে ও-কে ধরছি, যদি কোন প্রকারে ব্যবস্থাটার রদ করানো যায়। কিন্তু কারও কাছ থেকেই বল-ভরষা পেলাম না। অথৈ জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন করে খড়-কুটোকেই আঁকড়ে ধরে, তেমনি করে শেষ পর্যন্ত ছুহু চাচার শরণ নিলাম।

ক্ষণেকের তরে তিনি যেন বিহ্বল হয়ে পরেছিলেন। সে দিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দাওয়ায় বসে খাওয়া-দাওয়া হ'ল। সে-টা আর এমন কি বড় কথা! তাঁর বাড়ীতে তো আমরা যখন তখন খেয়েছি; আমাদের বাড়ীতে তাঁর বাড়ীর লোকেরাও কম খায়নি। এ সব বিষয়ে খুব একটা নিয়ম-কানুন বা সামাজিকতার বাঁধন ছিল না। ধর্ম আমাদের মধ্যে কোন দিনই ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। আমরা জানতাম, পরস্পরের প্রতি সহজাত শিষ্টাচার আর নিষ্ঠা। সেদিন চাচা-চাচীর আচরণে কি কিছুকটা ব্যতিক্রম ছিল? খাওয়া-দাওয়ার পরে ছুহু চাচা আমাকে ডেকে বলেছিলেন "বাজান, তুই শহরে যা। ভাল কইর‍্যা লোহাপড়া কর। আমাগ কথা ভুলিচ্‌ না, বাজান। চিঠি-পত্র দিচ্‌।" বলতে বলতে তার গলা যেন ভেঙ্গে এলো। কিন্তু আপত্তি করলেন আমার চাচী। খেঁকিয়ে উঠেছিলেন চাচার প্রতি—"তুমি ক্যামনতর মানুষ কও্‌ছেন। আমাগ এইটুন পোলাডা শহরে গিয়া থাকতে পারব?" তারপর আমাকে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর বুকে। চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চাচী বলেছিলেন—"বাজান, এ্যামন লেহা-পড়ায় আমাগ কাম নাই।" আজও চোখে ভাসে, কেমন করে ছুহু চাচা আমার

চাচীকে দাবড়িয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন "তুই চুপ করবি? বাজান আমার লাহান চাষার পোলা চাষা হইব? ওর কি মানুষ হওন লাগ্‌ব না?" পরের দিন তিনি নিজে মালপত্র সহকারে আমাকে শহরগামী বাসে তুলে দিয়েছিলেন। বাস ছেড়ে দেবার ক্ষনিক পরে জানালা দিয়ে থু-থু ফেলতে গিয়ে পিছন দিকে নজর পড়লো। দেখলাম ছহু চাচা অপসৃয়মান বাসের দিকে নিথর উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

ভালোয়-মন্দয় দিন কাটছিলো। একবার দীর্ঘস্থায়ী কাল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। শরীরটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যথারীতি আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে এ-মর্মে চিঠি গেল। অসুস্থ দেহ-মন নিয়ে একদিন ঘুমিয়ে রয়েছি। বিকাল তখন শেষ হতে চলেছে। চোখে-মুখে যেন কয়েক ফোঁটা তপ্ত জলের স্পর্শ পেলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখতে পেলাম ছহু চাচার বেদনাহত মুখ। দু'হাতে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

আরও কিছুকাল পরের কথা। আমাদের গ্রামের আস্তানা তুলে শহরে আনা হয়েছে। সংসারের প্রায় অর্দ্ধাংশ ইতিমধ্যেই আমার বাবার নূতন কর্মস্থল কলকাতায় চলে এসেছে।

শেষ পর্য্যন্ত ম্যাট্রিকের গাঁট পার হলাম। স্থির হলো কলকাতার কোন কলেজে ভর্তি হওয়ার। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হলো। কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে, ছহু চাচার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। দূর থেকে আমাকে দেখেই তাঁর কি হাঁক-ডাক। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেল! তিনি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন তার বাজান ছাড়া ভূ-ভারতের আর কেউ এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। লজ্জায় কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু তাঁর জোড়া পায়ে টুপ করে প্রণাম করে ফেললাম। তাঁকে আমার শেষ প্রণাম। হা-হা করে উঠে-ছিলেন। বলেছিলেন, "কি যে করচ;—তুই একটা পুরুষ না?" সেটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার।

কিশলয়ের মেলা॥

যে কথা তাঁকে জানাতে গিয়েছিলাম, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা আর বলা হলো না। বলতে গিয়েছিলাম, এবার পালাব,—ভিটে-মাটি ছেড়ে, মাতৃভূমি ছেড়ে—হয়তো বা চিরতরে। ইচ্ছা ছিল আমার চাচা-চাচীর সম্মতি চেয়ে নেব, আশির্ব্বাদ নেব। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না,—তাঁদের বাজান তাঁদের ফাঁকি দিয়ে আজীবনের জন্যে দেশান্তরী হতে চলেছে। সংসারের পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে আজও মাঝে মাঝে ভাবি—এ'টা কেমন করেছিলাম। এত বড় কাপুরুষতা আর বিশ্বাসহানি—সত্বেও তাঁরা কি কোন দিন আমাকে ক্ষমা করেছেন?

মাত্র কয়েক ফোঁটা তপ্ত-নোনা জল টেবিলে রাখা পুরো চিঠিটাকে অস্পষ্ট করে তুলেছিল। কখন যে আমার মেয়েটা ঘরে ঢুকেছিল লক্ষ্য করিনি। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল,—"বাবা তুমি কাঁদছো কেন?" তাড়াতাড়ি চোখ মুছে চিঠিটা পকেটস্থ করলাম। বললাম "কাঁদবো কেন মা! বড়দের কি কাঁদতে আছে? নস্যি নিতে গিয়ে কেমন করে যে খানিকটা চোখে পড়ে গেল। তাই……।"

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই যেন অস্বাভাবিক মনে হল। নিজেই অনুভব করলাম নিজের মুখ-বিকৃতি।

———

—: শারদীয়া অভিনন্দন :—

রুচিসম্মত ষ্টেশনারী ও নিত্যপ্রয়োজনীয়

দ্রব্যের জন্যে আপনাদের সাদর

আহ্বান জানাই।

"শ্যামলী"

নবব্যারাকপুর বাজার

(বয়েজ স্কুলের সামনে)

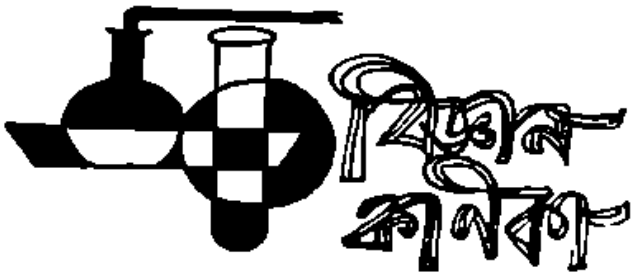

জেনে রাখা ভালো

সুজিত চৌধুরী

সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় ঃ —

সমুদ্রের জলের গভীরতা মাপার জন্য হাইড্রোফোন নামে একটা শব্দগ্রাহী যন্ত্র জলের সামান্য একটু নীচে ডুবিয়ে রাখা হয়। এর কাছে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করা হয়। যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা' সমুদ্রের তলদেশে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসে। হাইড্রোফোন তার মধ্যের স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে মূলশব্দ অর্থাৎ প্রথম শব্দের এবং দ্বিতীয় শব্দ অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে আসা মূলশব্দের প্রতিফলিত শব্দের সময়ান্তর লিপিবদ্ধ করে। এই সময়ান্তর থেকে এবং জলের মধ্যে শব্দের বেগ জানা থাকলে সমুদ্রের গভীরতা আমরা পেয়ে যাব, কেননা শব্দ মেপে পাওয়ার সময়ান্তর টুকুর মধ্যে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা সমুদ্র জলের গভীরতার দ্বিগুণ। এই উপায়েই সাধারণতঃ সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়ে থাকে।

২। শরীরের তাপ রক্ষা ঃ—

বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম থেকে আমরা শরীরকে রক্ষা করতে গরম জামা অথবা জামা ব্যবহার করি কেন? গায়ে জামা

থাকলে ঐ জামা তিনটি বিভিন্ন উপায়ে আমাদের শরীরের তাপকে রক্ষা করে।

ক) যখন গায়ে জামা থাকে, তখন শরীর আর জামার মধ্যে কিছুটা বায়ু আটকা পড়ে যায় সেটার কোন রকম চলাচল হয় না। তাপ-সঞ্চালন এই কারণে হতে পারে না। তাছাড়া বায়ু তাপের কুপরিবাহী অর্থাৎ বায়ু সহজে তাপকে তার মধ্য দিয়ে যেতে কিংবা আসতে দেয় না, ফলে আমাদের শরীরের তাপ একই থাকে, বাইরের ঠাণ্ডা কিংবা গরম দ্বারা প্রভাবিত সহজে হয় না।

খ) আবার যে সমস্ত গরম কাপড় শীতকালে ব্যবহার করে থাকি, তার মধ্য দিয়েও সহজে তাপ যাতায়াত করতে পারে না, এ ছাড়াও গরম কাপড়ের আঁশগুলি আলগাভাবে বোনা থাকে ফলে তাতে অনেক ছোট ছোট ছিদ্র মতন থাকে যার মধ্যে বায়ু আবদ্ধ। বায়ু আবার তাপের কুপরিবাহী যে কারণে গরম জামা পরলে ভেতরের শরীরের গরম বাইরে যেতে পারে না এবং বাইরের ঠাণ্ডাও শরীরে আসতে পারে না। কাজেই গরম জামা দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষিত হয়।

৩। সাদা বা কাল জামার ব্যবহার :—

শীতকালে সাধারণতঃ আমরা কালো জামা ব্যবহার করি এবং গরমকালে সাদা জামা। এর কারণ কালো রং পরিপার্শ্ব থেকে তাপ শোষণ করে। শীতকালে কালো জামা তাপ শোষণ করে এবং শরীরকে গরম রাখে। গরম কালে সাদা জামা পরার কারণ হল ঠিক উল্টো। সাদা রং সাধারণতঃ তাপ বিকিরণ বা প্রতিফলিত করে অর্থাৎ সহজে উত্তপ্ত হয় না। গরম কালে সেই জন্য সাদা জামা পরলে কিছুটা ঠাণ্ডা লাগে।

৪। ইলেকট্রিক ইস্ত্রী :—

তোমরা সাধারণতঃ সবাই ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দেখে থাকবে।

লক্ষ্য করলে দেখবে ইলেক্ট্রিক ইস্ত্রিতে যখন তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হয় তখন তার মসৃণ তলদেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এর কারণটা কি ইলেকট্রিক ইস্ত্রিতে ষ্টীল কভারের (যার সংগে হাতল সংযুক্ত থাকে) মধ্যে একটি তাপসহ দ্রব্যের (যা, অনেক বেশী তাপ সহ্য করতে পারে এবং বেশী তাপমাত্রাতেও অবিকৃত থাকে, যেমন পোড়া মাটি বা (fire Clay) ফ্রেমের উপর নাইক্রোমোর সরু তারের কুণ্ডলী জড়ানো থাকে। তারের এই কুণ্ডলীকে ষ্টীল কভারের মধ্যে রাখা হয়, কিন্তু তার সংগে কোন সংস্পর্শ ঘটে না। মেইন্ থেকে যখন শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহ এই তারকুণ্ডলীর মধ্যে চালনা করা হয় তখন তার গরম হয়ে ওঠে এবং লোহার আবরণও গরম হতে থাকে। যখন ষ্টীল কভারের মসৃণ তলদেশে উপযুক্ত উষ্ণতায় আসে কাপড় জামা প্রভৃতি ইস্ত্রি করা হয়।

— —

তরুণ উদীয়মান কবিদের জন্যে বলিষ্ঠ ঘোষণা

।। কবিতা সংকলন ।।

বেরুচ্ছে.....

সম্পাদনা করছেন শহরের কয়েকজন প্রতিশ্রুতীবান তরুণ কবি

যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক—মৌমাছি
১৫৭, মেইন রোড ওয়েষ্ট
নবব্যারাকপুর

প্রকাশক—কিশলয়ের মেলা
৪৪, জগদীশ বসু রোড
নবব্যারাকপুর

২৪-পরগণা

॥ রিন্‌টির পুতুল

সুবন্ধু সুর

রেডিওতে রাত্তির দশটা পাঁচ মিনিটের খবর পড়া শুরু হতেই বই বন্ধ ক'রে বিছানায় গেল তুতু। কিন্তু ওর ছোট বোন পুপু বিছানায় গেল না। সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা বলে একটু বেশি পড়াশোনা করে।

খবরে বললে, একটি ছোট মেয়ে তার প্রিয় পুতুলগুলিকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। ঘটনাটা হয়েছে কৃষ্ণনগরে। তারপর খবরটা পুরোপুরি বললো।

বিছানা থেকেই তুতু ইস্‌ ক'রে উঠলো। পুপু মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রইলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বই-এ মন দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। অনেকক্ষণ বইয়ের পাতা উল্‌টে এক সময় তুতুর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তুতুরও চোখে ঘুম আসেনি। কিন্তু খবরের পর রেডিওটা তুতুর বাবার ইচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে প্রায় আট দশ মাস হ'ল। তুতু আর পুপু সাহাগঞ্জে পিসিমার মেয়ের বিয়েতে গিয়ে দশ-বার দিন ছিল। বিয়ে বাড়ীর আনন্দ তো ছিলই তার সঙ্গে বেশি ছিল পিসিমার ছোট দেওরের সুন্দর ফুটফুটে পাঁচ বছরের মেয়েটি। চারিদিকে সকলেই কাজে কর্মে ব্যস্ত। তারই মাঝখানে কখন যে তার কীভাবে আবির্ভাব হ'বে কেউ ভাবতে পারে না। বাড়ীতে বিয়ে তাই ফ্রক সে পরবে না। কোমরে কাপড় জড়িয়ে খেলাঘরের বঁটিটা নিয়ে হঠাৎ এলো। "আর পারিনে বাবা, ওদিকে রান্নার কথা ভাববো না, এদিকে মাছ কোটা হচ্ছে না—তা দেখবো। মা, জেঠিমার নজরই নেই। —বলে বঁটি নিয়ে বসে পড়লো। তুতুরা তো হেসেই খুন। ওরা দু বোনে কাজকর্মের এমনি কত প্রশ্ন করে তাকে।

সেও তেমনি গুছিয়ে উত্তর দেয়। মিষ্টি মুখটি যেমন, গলার স্বরটিও তেমনি। খুব ভাল লাগে। কেবল ওর মা বিরক্ত হন। রিনটি হয়ে যায় তখন রিনটে। আর স্কুলে যে তিনি বেত হাতে মাষ্টারী করেন সেটাও বোঝা যায়।

বিয়ের পরের দিন সকাল আটটায় বারান্দার সিঁড়িতে ছেঁড়া ছেঁড়া কলাপাতা পেতে মাটির ভাঁড় সাজিয়ে ওর মাটির পুতুলগুলোকে খেতে দিয়েছে। বলছে, রাত্তিতে তোমাদের দিকে একটুও তাকাতে পাইনি। কে আর তোমাদের খোঁজ নিয়ে খাওয়াবে বলো। রিনটির এই গিন্নীপনা দেখেই তুতু পুপুকে বাইরে ডাকলে। পুপু আসতেই রিনটি কথা বন্ধ ক'রে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলো।

তুতু-পুপুর পিসির বড়ছেলের ছেলেটা আর মেয়েটা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটা মাটির ভাঁড়গুলো তুলে নিতে লাগলো। ওর দেখাদেখি তার ছোট বোন ছেঁড়া কলাপাতাগুলো কুড়িয়ে নিতে আরম্ভ করলো। রিনটি চুপ করে দেখলো। তারপর বললে—ওগুলো নিচ্ছিস কেন? যা রে, দুষ্টু, পাজি। ছেলেটা বললে—বেশ, খুশি। আমাদের তো। আমার পিসির বিয়ে। রিনটি তাড়াতাড়ি একটা ভাঁড় তুলে নিয়ে বুকে করে আগলে রাখলো। তখন দু ভাইবোনে ওর উপর আক্রমণ শুরু করলো। রিনটি প্রাণপণে ধরে রাখতে চেষ্টা করলো। তখন ছেলেটা রিনটির চুল ধরে টেনে মেঝেয় শুইয়ে দিল আর মেয়েটা জোরে কাঁধের উপর একটা কামড় বসিয়ে দিলে। রিনটি ককিয়ে উঠলো।

তুতুদের পিসতুতো দাদা বাইরে এসে দাঁড়ালো। রিনটিকে খেঁকিয়ে উঠলো। চেল্লাচ্ছিস্ কেন? বাড়ী যা। রিনটি কাঁদতে কাঁদতেই বললো—না রে দেখতে পাচ্ছো না, কেন কাঁদচি। তোমার ছেলেমেয়েরা তো আমায় মারলে। আমার ভাঁড়, কলাপাতা নিয়ে নিলে। দাদার মর্যাদায় যেন কথাটা ঘা দিল।—কি, মুখের উপর কথা। বলেই জোরে কানটা মলে দিল এবং একটা মাটির পুতুল আছড়ে ভেঙে দিল।

দোতলার বারান্দা থেকে রিনটির বাবা উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা সবই দেখছিলেন। বহুকাল আগে তুতুদের ওই দাদাটিকেই বই ছেঁড়ার জন্যে রিনটির বাবা একবার দু এক ঘা মারে এবং সারা দুপুর ঘরে বন্দী ক'রে রেখে দেয়। তুতুদের পিসিমা পিসেমশাইকে ব্যাপারটি সাতখানি করে

বলেন। পরের সপ্তাহে তিনি একটি নতুন বই কিনে এনে রিন্‌টির বাবাকে দিয়ে বলেন—এই নাও তোমার বই। আর শোনো, আমার ছেলের গায়ে কখনো তুমি হাত তুলবে না। মনে রেখো কথাটা। অন্যথা হ'লে আমার অন্য চেহারা দেখতে পাবে। রিন্‌টির বাবা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি সেদিন। কথাটা তখন তার মনে পড়লো কিনা কে জানে? একটু হেসে সরে গেলেন।

ফুলশয্যা হ'য়ে গেছে। মেয়ে-জামাই আসেনি। অনেক আত্মীয়ই চলে গেছে। তুতু পুপুই ছিল। মেয়ে-জামাই এলে সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়িয়ে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে তবে বাড়ী ফিরবে।

মাঝখানে একদিন দুপুরবেলা দেখা গেল রিন্‌টি খুব ব্যস্ত। বামুনদের রিংকির পুতুলের সঙ্গে ওর পুতুলের বিয়ে। রিংকির বাবা ডানলপে ভাল চাকরি করে। মা খুব ভাল। ছোট ছেলেমেয়ে ভালবাসে। রিন্‌টিকে খুবই ভলবাসে। রিংকির ছেলে, রিন্‌টির মেয়ে। তুতু পুপু সকাল থেকেই রিন্‌টিকে রাগাচ্ছে এই বিয়ে নিয়ে। বিয়ে না হাতি। বিয়ে তো গায়ে হলুদ কই। কই রিংকি তো গায়ে হলুদ পাঠালো না। বর আসবে কিসে? মোটরে না পাল্কীতে? পুপু বললে—আসবে বোধহয় মোষের পিঠে চেপে। রিন্‌টি রেগে গিয়ে বললে—তোমার বর আসবে মোষের পিঠে। পুপু হাসতে হাসতে বল্‌লে—হ'ল না, হ'ল না। রিন্‌টি বলতে পারলে না। তখন রিন্‌টি বল্‌লে—তবে কি হাতির পিঠে চড়ে আসবে? পুপু বললে নিশ্চয়ই—রাজপুত্তুর হাতি চড়বে না, ঘোড়ায় চড়বে না,—তো কি তোর পুতুলের মত রিংকির কোলে চড়ে আসবে। রিন্‌টি বুঝলো যে ঝগড়ায় পারবে না তাই ক্ষান্ত দিয়ে বল্‌লে—বেশ, বেশ, তোমাদের সব ভাল। হয়েছে তো। তুতু তখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—কনেটি তো বেশ। কিন্তু নিত্‌ কনে কই? রিন্‌টি নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো তিন রঙের একটা মাটির পুতুল দেখিয়ে বল্‌লে—ওই তো। আমার সই টুহর পুতুল হবে নিত্‌ কনে।

তুতু পুপুরা অবাক হয়ে গেল। সত্যি সত্যিই গায়ে হলুদ এলো ভর দুপুর বেলায়। পুপু তাড়াতাড়ি একটা শাঁখ এনে বাজিয়ে দিল। শাঁখের আওয়াজে রিন্‌টির জেঠিমা, তার ছোট মেয়ে স্বাতী, সেই দাদা ও তার সোহাগী মেয়ে, তার বৌ সবাই বারান্দায় জড়ো হ'ল। রিংকির

মা সত্যিই যেন নাতির বিয়ে দিচ্ছেন। একটা মিনি তত্ত্ব তিনি পাঠিয়েছেন। তুতু যত্ন ক'রে সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে দিতে জিনিস-গুলোর প্রশংসা করছিল। রিন্‌টি আর তার সই টুসুর মুখ চোখ যেন খুশিতে ডগ্‌মগ্‌ করছিল। এমন সময় রিন্‌টির বাপ-সোহাগী ভাইঝি বায়না ধরলো নিত্‌ কনের লাল সিল্কের শাড়ীটা তার চাই। অমনি বাপ বল্‌লে—রিন্‌টি, তোর ভাইঝির পুতুলকে নিত্‌ কনে কর। আর নিত্‌ কনের শাড়ীটা ওকে দে। রিন্‌টি বললে—তা কেন করবো। টুসুর পুতুলই নিত কনে হবে। ওই কাপড়টা পাবে। ওর দাদা বল্‌লে—টুসুর পুতুলকে একটা ফ্রক দিচ্ছি আমি। কি রে টুসু—বেশ ভাল ফ্রক দোব। রিন্‌টি জোরের সঙ্গে বল্‌লে –না, না। আমি কারো পুতুলকে নিত্‌ কনে করবো না। টুসুর পুতুলই নিত্‌ কনে হবে। ওর দাদা লোভ দেখাতে চেষ্টা করলো। বল্‌লে—একটা টাকা দোব বিয়েতে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবি, তাহলে করবি তো। রিন্‌টি তার গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটকে বেঁকিয়ে বল্‌লে—এক টাকা কেন? একশো টাকা—হাজার টাকা দিলেও আমি করবো না। তুমি আমাকে টাকা দেখিও না। তোমার টাকা তোমার থাক্‌। তোমার মেয়েকে দাও গে।

ব্যস্‌ যাই কোথা। কুলি মিস্ত্রী নিয়ে থাকা ঠিকেদারী মেজাজ চড়ে উঠ্‌লো ওর জেঠতুতো দাদার। চড়া গলায় বল্‌লো এই বারান্দা থেকে তোর পুতুল, খেলনা সব নিয়ে তোদের ঘরে যা। তা না হ'লে সব চুরমার করে দোব। আর তোর পুতুলের আমি নিকুচি করে ছাড়বো।

রিন্‌টি সব কিছু নিয়ে ওদের বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। আর আশ্চর্য হ'য়ে গেল তুতু-পুপুরা, পিসিমা, বৌদি, স্বাতীদি কেউই এর প্রতিবাদ করলো না।

নিকুচি কথাটার কি মানে রিন্‌টি জানে না। তাই ভয়ে ভয়ে তার পুতুল গুলোকে বার বার এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখতো।

মেয়ে-জামাই এসেছে। তুতু-পুপু-স্বাতী এবং বৌদিকে নিয়ে সব কলকাতা গেছে থিয়েটার দেখতে। বাপ্‌-সোহাগী মেয়ে বাপের কাছে রইলো। ভেতরের দোতলার সিঁড়ির গায়ে ছোট একটা ঘর আছে। সেই ঘরের খাটে শুয়ে আমেজ করছিল বাপ। ঘরটা একখানা ইটের গাঁথুনি দিয়ে সিঁড়ির সঙ্গে আলাদা। কোন সময়ে একটা ইট নোনা লেগে নষ্ট

হয়ে গিয়েছিল। সেটা দিয়ে সিঁড়ির তলার খিলেনের ছোট জায়গাটুকু দেখা যায়। গত বছর পুরোনো গাছটাকে নতুন করার পর কিছু ছোট্ট কিছু তুলো বেঁচেছিল। কোথায় আর রাখা যায় তাই সিঁড়ির তলায় ওই জায়গাটায় সেগুলো জমা করা ছিল। বাইরে ছোট্ট দরজাটা বন্ধ করে দিলে কারো চোখেই পড়বে না। রিনটি একদিন ওইখানে তার পুতুলগুলি সাজিয়ে খেলা করেছিল। মনে মনে রিনটি নিশ্চন্ত হয়েছিল যে এখানের সন্ধান তার দাদা পাবে না।

বাপ-সোহাগী মেয়ে বাপের বুকে কাঁধে চড়ছে, লাফাচ্ছে। একসময় তার ওই ইটের ফাঁকটায় চোখ পড়লো। কাছে গিয়ে ভেতরে কি আছে দেখতে লাগলো। চেঁচিয়ে উঠলো—ও বাবা, ওই দেখ, দেখ—রিনতির পুতুল। ওর বাপ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। দেখলে—সত্যিই তো। রিনটির পুতুলগুলো সাজানো রয়েছে। অমনি মাথায় এক বদ বুদ্ধি খেলে গেলে। আধ খাওয়া জলন্ত সিগারেটটা তাক করে পুতুলের বাক্সোটির উপর ছুঁড়ে দিল। দিয়েই মেয়েটা নিয়ে চলে গেল বাইরে।

রিনটির বাবা-মা দুজনেই চাকরিতে যায়। ঠাকুমার কাছে থাকে রিনটি। রিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে ওর ঠাকুমাও ঘুমিয়ে গেছে। এক সময় রিনটির ঘুম ভেঙে যায়। উঠে পড়ে। পাখাটা হাতে নিয়ে খাটের পায়াগুলোকে ছাত্রী করে নিজে দিদিমণি সেজে পড়াতে এবং শাসন করতে সুরু করে। তারপর হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে রান্নাবান্না করতে আরম্ভ করে। ও খেলাও বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। মনে পড়ে যায় পুতুলগুলোর কথা। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে।

সিঁড়ির দরজাটা একপেশে বসান হয়েছিল বলে একটা পাল্লা সব সময়ই বন্ধ থাকে। অন্য পাল্লাটা আবার আপনি বন্ধ হয়ে যায়। রিনটি দরজাখুলে ভেতরে ঢুকতেই পাল্লাটা বন্ধ হ'য়ে এবং উপরের ছিটকিনিটা আপনি পড়ে গিয়ে রিনটিকে বন্দী করে দেয়। রিনটি কিছু বুঝতেই পারেনি।

ওই ছোট্ট মেয়ে ভেতরে বন্ধ হয়েই হাঁপিয়ে ওঠে। কি বিশ্রী গন্ধ। কত ধোঁয়া। কোথায় পুতুলের বাক্স। কোথায় পুতুল।

সাড়ে তিনটের সময় ঝি কাজ করতে এসে দেখে যে ছোট ঘর থেকে খুব ধোঁয়া বেরুচ্ছে এবং কাপড় পোড়ার উৎকট গন্ধ। তাড়াতাড়ি রিনটি

জেঠিমাকে ডাকে। তিনি এসে দেখেন যে ছোটঘরে আগুনের চিহ্ন নেই। তবে সিঁড়ির তলার ছোট খিলেনের মধ্য থেকে ধোঁয়া ঢুকছে ছোটঘরে। চীৎকার করে রিন্‌টির ঠাকুমাকে ডাকেন। বুড়ির যেন মরণ ঘুম পেয়েছিল। পাশের বাড়ীর লোকজনেরা এসে গেল তখন বুড়ির ঘুম ভাঙ্‌লো না। অনেকক্ষণ পরে বুড়ি উঠে বললেন—কি হয়েছে গো, বৌমা। রিন্‌টি কাঁদছে, রিন্‌টির জেঠিমা বল্‌লে—না, না, সিঁড়ির তলায় খিলেনের ঘরে আগুন। আঁ।—আগুন। কোথায়? কি বল্‌লে! সিঁড়ির তলায়? সে কি গো?—বললে বুড়ি অবাক হ'য়ে।

তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলেই দেখতে পেলেন—রিন্‌টিকে। এক-হাতে টুপুর সেই পুতুলটি আর অন্য হাতটা যেন কিছু একটা জিনিসকে ধাক্কা মারছে। নিথর, নিঃস্পন্দ।

বুড়ী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। পাড়ার ছেলেরা এসে কোন কথা না শুনেই তাড়াতাড়ি একটা স্কুটার-রিক্‌সায় ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে। কোন উপায় নেই। দম্ বন্ধ হ'য়ে মারা গেছে বললো তারা।

রিন্‌টির বাবা, মা, আর ঠাকুমা পাগলের মতো হ'য়ে গেল। তুতুদের পিসির বাড়ীর কারো মুখেই এক আধ বার হা হুতাশ ছাড়া আর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। চারদিন পরে অত্যন্ত ব্যথাতুর মন নিয়ে দু'বোনে সেবার বাড়ি ফিরছিল।

* * *

তুতু পুপু দুজনেরই চোখে ঘুম আসছিল না। এক সময় তুতু বল্‌লে পুপু, রেডিওতে খবরটা শুনে তোর মন খারাপ হ'য়ে গেল, না রে! পুপু বল্‌লে—তোর! তুতু বললে আমারও।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। দুজনে দুজনকেই জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো। কেউ কাউকেই সান্ত্বনা দিল না। এক সময় দুজনেই চুপ করলো—কিন্তু দুজনের চোখে তখন অশ্রুর বন্যা।

———

॥ ঘটক পাড়ার দত্তমশাই ॥

সনাতন চক্রবর্তী

ঘটকপাড়ার দত্তমশাই,
লোকটা তিনি এমন কশাই·
চাইলে কেহ একটা কড়ি
আসেন তেড়ে বাগিয়ে ছড়ি।
বলেন ব্যাটা বদের ধাড়ি,
বসিয়ে দেব ছড়ির বাড়ি
দূর হয়ে যা সামনে থেকে
পিত্তি চটে তোদের দেখে।

॥ হালুম হুলুম ॥

পৃথ্বীশ পত্রনবীশ

হালুম হুলুম
করবো জুলুম,
তোকে এবার
বাগে পেলুম,

দেবো কামড়
তবে মালুম,
বলবি তখন
গেলুম গেলুম ॥

আলোচনা

॥ মোপাসাঁ কথা প্রসঙ্গে ॥

কালিদাস গুহ

গী দ্য মোপাসাঁ আজ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। শুধু পরিচিত বললে ভুল হবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ও সাহিত্যে মোপাসাঁ প্রভাব প্রগাঢ়।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিহাসে মোপাসাঁ একটি অবিস্মরণীয় নাম ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট তিনি Chatean de Miromesrib-এ জন্মগ্রহণ করেন। মোপাসাঁর পিতা লোরেন দেশীয় ও মাতা নরমাণ্ডি দেশীয়া। কিন্তু গী দ্য মোপাসাঁর জন্মের আগেই মোপাসাঁ পরিবার নরমাণ্ডিতে বাস উঠাইয়া আনেন।

নরমাণ্ডিতে মোপাসাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। সেখানেই তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয়ান যুদ্ধে কুড়ি বছরের যুবক মোপাসাঁ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে সরকারী কাজ নেন। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এই দশ বৎসর কালে মোপাসাঁ গভীর সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হন। খ্যাতনামা উপন্যাসিক ফ্লবেয়ারের (Gustava Flaubert) কাছে তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মোপাসাঁ সাহিত্যকে উজ্জ্বল তারকার মত আত্মপ্রকাশ করেন। "Les Soire'es de Medan"—কাগজে তাঁর প্রথম গল্প "বুল-দ্য-সুইফ" (Boule de Suif) প্রকাশিত হয়।

এই গল্প মোপাসাঁর ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে। মোপাসাঁর নাম চারদিক ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগম। চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। গভীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন মোপাসাঁ।

গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনায় অপর্যাপ্ত অর্থাগম হল। শৈশবের ভ্রমণ নেশা ভ্রমণপাগল মোপাসাঁকে পেয়ে বসল। নরমাণ্ডির গণ্ডীতে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি! Yecht (যার নাম দিয়েছিলেন Bal Ami) কিনলেন ভ্রমণের জন্য। এই Yecht-এ বেড়িয়ে পড়লেন আলজেরিয়া, মিসিলী প্রভৃতি দেশে। ফলে সৃষ্টি হল তিনটি অনন্য ভ্রমণ কাহিনী।

তের বৎসরের সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের জন্য রেখে গেলেন বহু গল্প গ্রন্থ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা সংগ্রহ, নাটক ও প্রবন্ধ।

শারিরীক অত্যাচারে মোপাসাঁর শরীর ভেঙ্গে গেল। পক্ষাঘাতে তাঁর সর্বাঙ্গ আক্রান্ত হল। মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই মোপাসাঁর মৃত্যু হয়।

———

Phone : 35-5566

THE EASTERN INDIA OFFICE STATIONERS

Office : 27/2, JUGAL KISHORE DAS LANE, (CHALTABAGAN)

CALCUTTA-6

Dealers in :

OFFICE STATIONERS, FILES, ENVELOPS, CLIP, BLOTTING PAPER, GUM, GEMS CLIP, WRITING INK, PENCIL, REFIL (CARAVAN) RUBBER STAMP MAKERS ETC.

গল্প

॥ বাঘ শিকার ॥

সুনীল মুখোপাধ্যায়

জানো তখন আমি তোমাদের আজকের মতই দশ-এগার বছরের ছেলে। পুজোর ছুটিতে সেবার বাবার কাছে গেছি। বাবা ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। বাগানের যিনি ম্যানেজার, তিনি ছিলেন খাঁটি সাহেব এবং শিকারে পারদর্শী। প্রায়ই আস্থাভাজনদের নিয়ে শিকারে বেরতেন। সেবারে গিয়ে দেখি কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা কাণ্ড পাহাড়ে বাঘ শিকারে যাচ্ছেন। কলকাতা থেকে গেছেন আমার মামা, তিনি এবার ওঁদের অতিথি। আমিও বায়না ধরলাম শিকারে যাব বলে। শুনে তো বাড়ীর লোকের চোখ কপালে উঠে গেল। বাবা ঐ বিপজ্জনক স্থানে নিয়ে যেতে রাজী নন। কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ঠেকাবে কে? বাবা হাসিমুখে আমার পাগলামির কথা সাহেবকে বলতে গিয়েই ফেঁসে গেলেন। সাহেব বললেন - "ও, কে, খোকাবাবু হামাডের সহিট্ যাইবে।" বাবা আপত্তি করতে গিয়েও হেরে গেলে খবর শুনে আমি তখন নাচ্চি।

পুজোর কয়েকদিন পরে একদিন শেষ দুপুরে তিনখানা জিপ গাড়ীতে আমাকে নিয়ে মোট সাড়ে বারো জন লোক রওনা দিল হিমালয়ের কোলে ছত্রিশ মাইল দূরের কাণ্ড পাহাড়ে। প্রথম গাড়ীতে বন্দুক নিয়ে সাহেব, আমার বাবা, ডাক্তারবাবু ও আমি, আর পিছনে টাঙ্গি, বল্লম, ধনুক, দড়ি, কয়েকটা সাত ব্যাটারি টর্চ

নিয়ে গোটা আষ্টেক জোয়ান কুলি। এছাড়া ওদের সঙ্গে রয়েছে একটি ছাগল। বড়রা নানারকম গল্পগুজব করছে। আমি চুপচাপ। তবে মাঝে মাঝে সাহেব ভাঙ্গা বাংলা ও হিন্দীতে আমার সঙ্গে কথা বলছে। উঁচু নীচু পাহাড়ী পথে গাড়ী চলছে। প্রথমে আমাদের সেখানকার ফরেষ্ট-বাংলোয় পৌঁছুতে হবে—খবর দেওয়া আছে। মাইল কয়েক আগেই সন্ধ্যা নেমে এলো। তীব্র আলো ফেলে গাড়ী এঁকে বেঁকে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'একটি জন্তু রাস্তা পার হচ্ছিল. আলোয় দেখা যাচ্ছিল বুনো মোষ, শুয়োর এমন কি একটি চিতা বাঘ পর্যন্ত জিপ-এ বসে বসে দেখলুম, গাড়ীর আওয়াজ ও আলো দেখে হক্‌চকিয়ে পালাচ্ছে। সাহেব নির্দেশ দিলেন—স্পীড্ না কমিয়ে জোরে গাড়ী চালাও। সকলের মাঝখানে বসেও গা ছম্ ছম্ করছিল—বাইরে আলো, কিন্তু গাড়ীর ভেতর অন্ধকার। মাঝে মাঝে সাহেবের বন্দুকটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিচ্ছিলুম।

রাত প্রায় ন'টা নাগাদ বাংলোয় পৌঁছুলাম। খুব শীত পড়েছে। গরম গরম চা, কফি, সব এলো। সাহেব অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন সব ঠিক আছে কিনা। কিছুক্ষণ পরে রুটি, হরিণের মাংস ইত্যাদি খেয়ে আমরা দশটা নাগাদ পায়ে হেঁটে চললাম বনের ভিতর। বন্দুক প্রস্তুত রেখে বড় টর্চ ফেলে ফেলে এগুতে লাগলাম। এদিক ওদিক থেকে নানাপ্রকার বুনো পাখী ও জীবজন্তুর কর্কশ চীৎকার কানে আসতে লাগল। ভয়ে তখন আমার অবস্থা কাহিল। কিন্তু ভাবখানা দেখাচ্ছি-ওসব কিচ্ছু না। বাবা বিরক্ত হলেও তিনিই আমোকে আগলে নিয়ে যাচ্ছেন। মামা আমার গা ঘেঁষে চলছেন সব সময়। গভীর পাহাড়ী জঙ্গল। কিছুদূর গিয়ে একটা বড় বড় ঘাসভর্তি জায়গার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক তার পাশে শালের খুঁটি দিয়ে লতাপাতা জড়িয়ে, প্রায় কুড়ি ফুট্ উঁচু একটা বড় মাচান বাঁধা রয়েছে। মই দিয়ে আমরা সবাই এক এক করে তার ওপর উঠলাম এবং শেষে মইটি ওপরে তুলে নিলাম। কেননা, ধূর্ত চিতাবাঘ নিঃশব্দে কখন উঠে আসতে পারে।

ছাগলটাও আমাদের সঙ্গে এসেছিল এবং তাকে মাচানের নীচে একটু তফাতে বাঁধা হোল, যা'তে ঐ জায়গায় জল খেতে এসে বাঘ ছাগলের গন্ধে ও ডাকে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসে বন্দুকের নাগালের মধ্যে। গাঢ় অন্ধকার। আকাশ ভর্তি নক্ষত্র। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ফুল ফোটে জোনাকী উড়ছে। মাঝে মাঝে আমার অলেষ্টারে ধাক্কা খেয়ে কোলের ওপর পড়ছিল—রাত্রে জোনাকী ছুঁলে কি যেন হয়··· তাই বারবার মনে পড়ছিল ও ভয় করছিল। হঠাৎ হঠাৎ বন্যজন্তুর বিকট ডাক কানে আসতে লাগল—চমকে উঠছিলাম। মাচানের মাঝখানে বসে আমি মামাকে, মামা আমাকে, জড়িয়ে ধরে চোখ বুজিয়ে বসে ছিলাম। পিছনে কুলিরা। সামনে বাবা, সাহেব ও ডাক্তারবাবু বন্দুক তাক্ করে মাচানের ওপর থেকে ঝুঁকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। সাহেবের কড়া নির্দেশ—কোন প্রকার শব্দ করা চলবে না। কথা বলা, বিড়ি সিগারেট খাওয়া, এমন কি কামড়ে ছিঁড়ে ফেললেও মশা মারা চলবে না। হঠাৎ কিছু দূর থেকে বাঘের ডাক কানে আসতেই সাহেব মুখে শব্দ করে সবাইকে সচেতন করে দিল। আমি ও মামা পরস্পরকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলুম। ছাগলটির পরিত্রাহি চীৎকার ক্রমশঃ ক্ষীণ ও কাঁপা কাঁপা হয়ে এলো। বোঝা গেল তিনি আসছেন।

এলেন এবং ছাগলটির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে কয়েক হাত দূরে থাবা গেড়ে বসলেন। কিন্তু এমন জায়গায় বসল যে গুলি করলে ছাগলটিও যায়। তাই সাহেবরা অপেক্ষা করতে লাগলেন উপযুক্ত সময়ের (এসব কথা শুনছিলাম পরে বাবা যখন বাড়ীতে গল্প করেছিলেন)। মাঝে মাঝে উল্লাসে বাঘটি ডাক ছাড়ছিল, আর ছাগলটি তখন মৃতপ্রায় ও বিন্দুবৎ হয়ে গেছে ভয়ে। এবার বাঘটি একটি থাবায় ছাগলটির ঘাড় মটকে ফেলে রক্ত পান করার উদ্যোগ করছে ও মৃদু গর্জন করছে—এমন সময় মাচানের ওপর থেকে ছড়্ছড়্ করে খানিকটা জল নীচে শুকনো পাতার ওপর পড়তে লাগল।

আচমকা ঐ শব্দ শুনে বাঘটি চকিতে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। শিকার ফস্‌কে যেতে ক্ষিপ্ত সাহেব দারুণ বকাবকি করতে লাগলেন। জল এলো কোথা থেকে ? কেউ তো সঙ্গে আনে নি, শীতের রাতে। যেটুকু আছে শরীরের ভেতরে। সকলের নজর পড়ল তখন জড়াজড়ি করে থাকা মামা-ভাগনের ওপর। মামা আমাকে জড়িয়ে ধরেই বললেন—'তুই'। আমি চোখ-বোজা অবস্থাতেই বললাম, "না—তুমি করেছ।" আজো সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি।

যাই হোক, আবার প্রতীক্ষা চলল। আমরা চুপ্‌চাপ্‌ বসে রইলাম অন্ধকারের রহস্যালোকে। কেবল ছাগলটি ডেকে ডেকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছিল। এমনি করে কতক্ষণ কাটবে জানি না। একটু তন্দ্রা এসেছিল—গভীররাত্রি, বনফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে, হঠাৎ গুলির শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। দেখি সারা মাচানের ওপর তখন দারুন ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। আহত বাঘটি গুলি খেয়ে বন্দুকের নলের অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে এমন লাফ মেরেছিল যে, আর একটু হলে মাচানের নাগাল পেয়ে যেত। আমার বাবা আরো দু'টি গুলি করায় বাঘটি মাটিতে পড়ে ল্যাজ আছড়াতে লাগল আর গর্জাতে লাগল। আমার ও মামার অবস্থা তখন বলবার নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাঘটি নিথর হয়ে গেল। মিনিট পনের অপেক্ষা করে চতুর্দিকে টর্চ ফেলে ভাল করে দেখে নিয়ে, সকলে বসলাম নীচে। গুলির শব্দ শুনে বাংলো থেকে দু'খানা জিপ এলো, একটার বনেটের ওপর প্রায় ১২ ফুট রয়াল বেঙ্গল টাইগারটিকে শুইয়ে অক্ষত ছাগলটাকে নিয়ে আমরা বাংলোতে চলে এলাম। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে।

বেশ ঠাণ্ডা। ঘরের কোনে আগুন জ্বলছে। চা-ককি খেতে খেতে সবাই গল্প করছে। কুলিরা ঘরের বাইরে শুকনো কাঠ-পাতা জ্বেলে আগুন পোয়াচ্ছে। হঠাৎ বাবা-রে মা-রে করে চীৎকার করে কুলিরা ঘরের মধ্যে ছিটকে চলে এলো। বলল-বাঘ, বাঘ। সঙ্গে

সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোল। কিন্তু ছাগলটা বাইরে রয়ে গেছে। সাহেব বললে—যা ভেবেছিলাম তাই, বাঘিনী আশপাশে ছিল। সত্যি সে ছাগলের লোভে আসে নি, এসেছিল প্রতিশোধ নিতে। জানলার বাইরে থেকে বাঘিনীটা খাড়া দাঁড়িয়ে কাঁচের সার্সির গায়ে থাবা বোলাতে লাগল এবং ভেতরে আসার জন্যে প্রত্যেকটা জানলায় চেষ্টা করতে লাগল। ঘরের ভেতর দিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সাহেব বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে সোজা ওপরে চলে গেলো, পেছনে বাবা ও ডাক্তারবাবু। মাচানের মত শুয়ে পড়ল, কিন্তু বাঘিনীটি ভিতের কাছে রয়েছে, গুলি করা শক্ত। কি করা যায়। এমন সময় সাহেব দেখল ছাদের ওপর একটা ঝুড়ি উপুড় করা রয়েছে। বুদ্ধি করে সেটা বাঘের কাছাকাছি ভিতের খানিকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলতেই বাঘটি প্রচণ্ড আক্রোশে তাকেই শত্রু মনে করে ছুটে গেল, ঠিক সেই সময় তিনখানা বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে বাঘিনীটি ওখানেই লুটিয়ে পড়ল। তখন ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে।

ভাল করে সকাল হতে সবাই বেরুলেন। তারপর চা-টা খেয়ে আমরা বাঘ দুটোকে নিয়ে এবং ছাগলটিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম। দুপুরের মধ্যে বাড়ী ফিরলাম। অল্পসময়ের মধ্যে বিরাট ভীড় জমে গেল।

নবব্যারাকপুরের একমাত্র যুব পত্রিকা
মফস্বলে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর ত্রৈমাসিক
বে.....ক.....লো

"মৌমাছি"র শারদ সংখ্যা

যোগাযোগ করুন—সম্পাদক "মৌমাছি"

১৫৭, মেইন রোড ওয়েষ্ট
পোঃ—নবব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র সঙ্গীতের উৎস সন্ধানে

ডাঃ সৌরেন্দ্র নারায়ণ বসু

প্রতিভার সঙ্গে পরীপূর্ণ অনুকূল পরিবেশ কর্মদক্ষ মানুষকে যে কতবড় করে তুলতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে গান অন্যতম। আজন্ম সাংগীতিক পরিবেশ ও প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞদের সহচর্য্য তাঁর শিক্ষা সংস্কারকে বিশুদ্ধ সংগীতরসে পরিপূত করে দিয়েছিল। গান তাঁর হৃদয় ও অনুভূতিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর সংগীত প্রতিভা উন্মেশের মূলে আশৈশব সাংগীতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"বাংলাদেশে আধুনিকযুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি।···দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীত বিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ ব'লে গণ্য হ'ত।····· গান সম্পর্কে তখনকার দিনের ধনীসমাজের সংগে এ যুগের ধনীসমাজে একটা বড়ো পার্থক্য এই যে, সে যুগের বড়ো লোকেরা গানটাকে কেবলমাত্র সৌখিন আমোদের বিষয় বলে মনে করতেন না, বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর সংগীতকে। তাঁরা মনে করতেন, ভালো গান শোনার বা ভালো গায়ককে যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা তখনই জন্মায় যখন সেইদিকে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা যায়।" ঠাকুর পরিবারেও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিল না। পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিশুদ্ধ মার্গ সংগীত শেখাবার জন্য একজন

না। একজন খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিভাবান ওস্তাদ গৃহশিক্ষকরূপে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকতেন যেমন বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র। রামপ্রসাদ মিশ্র সেতার শিক্ষক ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এঁর কাছেই প্রথম গান শেখেন।

বিশুদ্ধ মার্গসংগীতের একনিষ্ঠ ভক্ত, পৃষ্ঠাপোষক ও মোটামুটি গায়ক পিতা দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে সত্যিকারের সাংগীতিক পরিবেশ রচনা করেছিলেন এবং পুত্রদের সংগীত সাধনায় আন্তরিক অনুপ্রেরণা দিতেন। বস্তুতঃ তাঁরই একান্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর পুত্রগণ সংগীত ক্ষেত্রে যুগজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। নিছক সখের জন্য বা আভিজাত্যের পরিচায়ক হিসাবে বাড়ীতে সংগীত চর্চ্চার আয়োজন তিনি রাখেন নি,—"মৃতপ্রায় ভারতীয় সংগীতের পুনরুজ্জীবনই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য"।

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ,সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেই নিষ্ঠা সহকারে উচ্চাঙ্গ সংগীত অনুশীলন করে 'বিশেষজ্ঞ' ও 'গীত রচয়িতা' বলে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রথম প্রবর্তন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৭৬ সালে এবং পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে সহজ ও সরল করে প্রচার করেন। উত্তর ভারতীয় সংগীতক্ষেত্রে এর চেয়ে সার্থক ও বিজ্ঞান সম্মত স্বরলিপি আর নেই।

সে যুগে কিন্তু অভিজাত পরিবারে মেয়েদের গান বাজনার চর্চ্চাকে নিন্দনীয় বিষয় বলে গণ্য করা হত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুর পরিবারের মেয়েরাও সংগীত চর্চ্চা করতেন এবং সর্ব্বসমক্ষে গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দিতেন। এই পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলাদেবী, ইন্দিরাদেবী ও প্রতিভাদেবী সংগীত মহলে বিশেষ পরিচিত কয়েকটি নাম।

ঠাকুরবাড়ীতে নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানাদি প্রায় সবসময়েই

লেগে থাকত এবং অনুষ্ঠান-উপযোগী গান রচিত ও সুরারোপিত হোত বাড়ীর কারো না কারো দ্বারা—অবশ্য বেশীর ভাগই উচ্চাংগ পদ্ধতির ঢং এ। মোটকথা হচ্ছে বিশুদ্ধ ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীতের পরিবেশে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন —"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাইতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীত বিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোন অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

ঠাকুর বাড়ীর এই জমজমাট সাংগীতিক আবহাওয়ায় কারো পক্ষেই গান বাজনা ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাড়ীর অন্যান্যদের মতো কখনো নিয়ম-মাফিক গান শেখেন নি। তাঁর সংগীত শিক্ষার বেশীর ভাগটাই হয়েছিল অপ্রত্যক্ষভাবে। বাড়ীর গুণী ওস্তাদ শিক্ষকদের প্রভাব পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে তাঁকে। সারাজীবন সংগীত রচনায় ও সুরারোপে। এঁদের কথা তিনি ভুলতে পারেননি কোনদিনই এবং এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও তিনি জানিয়েছেন নানাভাবে। কিন্তু এঁরা কেউই পারেন নি রবীন্দ্রনাথকে নিয়মিত গান শেখাতে। যদুভট্ট তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে ওস্তাদী রীতিতে গান শেখাবার জিদ ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেছেন— সেইজন্যই ভালোকরে হিন্দীগান শেখাই হোল না তাঁর। তিনি গান শিখতেন লুকিয়ে চুরিয়ে। বিষ্ণুর কাছে গান শেখা সম্পর্কে তিনি বলেছেন "আনমনে ব্রহ্মসংগীত আউড়িয়েছি অনেক সময়, আবার যখন আপনা হতে মন লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।" ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনে সংগীত রচনায় প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। চোদ্দ বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথকে বারোবৎসরের বড়ো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্ধুর মতো সংগ দিয়ে নিজের কল্পিত সুরের খেলায় তাঁকে কথা বসাতে বলতেন। এইভাবে তিনি ভাবি গানের রাজা'কে গান রচনার শিক্ষা দিতেন। এ সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চ্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। আমি অবাধে তাহার সংগে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়া ছিলেন, প্রত্যহই তাহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত, আমি তাহার সেই সদ্যজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এই রূপেই আমার আরম্ভ হইয়াছিল।" ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসাধারণ গুণপনার ইতিহাস সংগীতজ্ঞমহলে সুবিদিত। কিন্তু তাঁর স্বভাব তদানিন্তন ওস্তাদদের মত অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল না। তিনি 'সচল পুরনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে এসেছিলেন নির্জ্জলা নূতন মন নিয়ে'। সংগীতবিদ্যাটিকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য, সহজলভ্য করবার চেষ্টায় নূতন পথে চলতে গিয়ে সঙ্গী করেছিলেন ছোটভাই রবীন্দ্রনাথকে। সেই প্রচেষ্টার ফলেই যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে এমন এক সার্থক গীতিকার হয়ে উঠেছিলেন—একথা বল্‌লে ভুল হবে না।

শিক্ষানবিসির কাল সমাপনান্তে যখন রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা বা গানে সুরারোপ করতে লাগলেন তখন দেখা যায়, হিন্দীগানের নিয়মকানুনগুলো তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়ে যেমন নিজের কাজে প্রয়োগ করছেন, তেমনি আবার ঐ একই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

সুর সৃষ্টির পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় এসে দেখতে পেয়েছেন নূতন পথের আলো। এই তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। তারপর তিনি বাংলার নিজস্ব সম্পদ—লোকগীতি—যেমন কীর্তন, বাউল, সারিগান ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ সব সুরকে 'আপনাইয়া লইয়া সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। পরবর্তী পরিণত বয়সেরও রচনায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট ফুটে ওঠে—যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগীত ধারার পরিচয় আমরা পাই। অতএব রবীন্দ্র সংগীতকে এই তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বল্‌লে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সুর ও বাণী হাত ধরাধরি করে যুগলমূর্তিতে যখন উপস্থিত হয় তখনই সার্থক গানের সৃষ্টি। এমনি বেশে তারা এসে কবির কল্পনারাজ্যের দোর গোড়ায় হাজির হোত। বাণী ও সুর যুগপৎ কবিমানসে জেগে উঠ্‌ত। বাণীরূপ ধরে রাখা হোত কাগজে কলমে—কিন্তু সুর? সে তো নূতন সুরের আগমনে জলতরঙ্গের মত মিলিয়ে যেতে চায়—তাই তাকে ধরে রাখতে সংগীতজ্ঞ নাতি দিনেন্দ্রনাথকে কবি সর্ব্বদাই কাছে রাখতেন। তিনি ছিলেন যেন একটি জীবন্ত টেপ্‌রেকর্ডার। নূতন যে কোন গানের সুর শোনামাত্র নির্ভুলভাবে কণ্ঠে আয়ত্ত করবার দক্ষতা দিনেন্দ্রনাথের সহজাত ছিল—তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। তার উপর সুর লিপিবদ্ধ করবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুনিপুন। কোন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, এমন কি মুখে গুণগুণ মাত্র না করেও—যেন শ্রুতলিপি লিখনের মত অবলীলায় তিনি শ্রুত স্বরলিপি করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের স্বরলিপিই দিনেন্দ্রনাথ-কৃত। দেশী বিদেশী উভয় সংগীতেই অত্যন্ত পারদর্শী হয়েও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতেরই একনিষ্ঠ সাধক, পূজারী ও প্রচারক। সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে বিমূর্ত প্রতিভা, তাঁকে সর্ব্বসাধারণের গোচরে এনেছেন এই দিনেন্দ্রনাথই। আজ বাংলার ঘরে ঘরে এবং তার বাইরে সারাভারতে এমন কি বিদেশেও রবীন্দ্রসংগীতের যে এত

প্রচার এসবের গৌরব দিনেন্দ্রনাথেরই—আর কারো নয়। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন –দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে—

"রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে—
না লইতে আপন করি, যদি না দিতে সবারে।"

কথা ও সুরের সার্থক রূপায়ন যে রবীন্দ্রসংগীত—যার বিস্তৃতির শেষ কোথায় জানি না—যা, দেশ কাল পাত্রের, যোগ্য অযোগ্যের কোন ভেদাভেদ রাখেনি—প্রকাশ করেছে সকলের অন্তরের এক অকল্পিত মধুর যোগসূত্র—যার ভাষা, সুর, ছন্দ এবং সর্বোপরি ভাবের গভীরতা মনে করিয়ে দেয় প্রত্যেককে—এ যেন নিজের অন্তরের কথা—এই যে এক অকল্পনীয় সৃষ্টি, এর পেছনে কাজ করেছে কবির সহজাত প্রতিভা, আশৈশব বিশুদ্ধ সুস্থ সুন্দর সাংগীতিক পরিবেশ ও প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞদের সাহচর্য্য এবং সর্ব্বোপরি তার নিরলস পরিশ্রম। এসবেরই ফলশ্রুতি হিসাবে তাইতো আমরা বলতে পারি—

"জগৎ কবির সভায় আমরা তোমারই করি গর্ব
বাংগালী আজি গানের রাজা বাংগালী নহে খর্ব্ব।"

— ০ —

সাক্ষাৎকার

আগামী সংখ্যায় যশস্বিনী অভিনেত্রী **জয়শ্রী সেন**-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

—**অভিমুখ**।

প্রসঙ্গ

।। কিশলয় আসর প্রসঙ্গে ।।

কমলারঞ্জন বিশ্বাস

বর্ষা বিদায় নিয়েছে, শরতের স্নিগ্ধ বাতাস বঙ্গবাসীর মনে খুশীর জোয়ার এনে দিয়েছে ; কেননা শারদোৎসব সমাসন্ন, তাই আজ আমরা নানা ভাবে ব্যস্ত মাতৃবন্ধনার আয়োজনে। এরই ফাঁকে আমি সুধী জনের হাতে তুলে দিতে চাই "কিশলয় এর মেলা" কিশলয় সব-পেয়েছির আসরের মুখপত্র খানি। ছোটদের এই সবপেয়েছির আসর বড়দের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা পাথেয় করে নীরবে এগিয়ে চলেছে নানা বৈচিত্রময় কর্ম-ধারার মধ্যদিয়ে। গত এক বৎসরে এই আসর কতটুকু কাজ করতে পেরেছে তার একটা হিসাব আপনাদের অবগতির জন্য রাখছি।

আসরের সোনারকাঠির সংখ্যা গত বারের মতই আছে। কিশলয় আসর মূল কেন্দ্রের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয় ; কেননা এটা হ'ল পাতভাড়ির একটি শাখা। একটি দায়িত্বশীল কর্মী-পরিষদ আসর পরিচালনা করে থাকে। কাজের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে দপ্তর ভাগ করা হয়েছে যেমন—দপ্তর, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, ব্রতচারি, শিবির, শিক্ষন, পাঠাগার, সাহিত্য, নৃত্যগীত ও পত্রিকা। একমাত্র পত্রিকা দপ্তরটি সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য নাট্যকার নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এক

জন প্রধান সচিব নিযুক্ত আছেন। সহঃ সংঘমিত্র শ্রী তড়িৎ কান্তি রায় আন্তরিকতার সংগে নানা ভাবে কর্মীদের সাহায্য করছেন। কর্মীরা নিজ নিজ দায়িত্ব যথা সম্ভব আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন। আসর একটি শিশু সংগঠন হওয়ায় কর্মীদের প্রত্যেককে শিক্ষকের মত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। কর্মীদের ত্যাগ ও কর্তব্য নিষ্ঠা সকলের প্রশংসার দাবী রাখে। আসরের দৈনন্দিন কাজ যথা ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, ছড়া, ডাম্বেল, লেজিম ও অন্যান্য খেলাধূলা নিয়মিত চলছে। মূল কেন্দ্রের পরিচালনায় ২টি মাসিক ১টি বাৎসরিক শিবিরে, কর্মী শ্রীপঙ্কজ দের নেতৃত্বে সোনার কাঠি ভাইবোনেরা যোগদান করে সুনাম অর্জন করে। নববর্ষ উৎসবে দেশবন্ধু পার্কে আমাদের আসর সুসজ্জিত বাদ্যবিভাগ বাঁশীসহ যোগদান করে। গত ১৮ই মে কলিকাতার রবীন্দ্র কাননে "রবীন্দ্র উৎসবে" আমাদের কর্মীরা নাট্যকার নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "মাকড়সা" নাটকটি শ্রীমৃণাল চৌধুরীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ ক'রে প্রচুর সুনাম অর্জন করে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগীতার পুরস্কার দেওয়া হয় ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে। আসরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উক্ত প্রতিযোগিতায় অভিভাবকরাও অংশ গ্রহণ করেন। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা পুরস্কার সামগ্রী সংগ্রহে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। আসরের পাঠাগারের উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থানের বিরাট আশা নিয়ে গত জানুয়ারী মাসে নাট্যতীর্থের সহ যোগীতায় যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন বাধার সম্মুখিন হওয়ায় সে আশা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনির ব্যবস্থা করা হয়। আসরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান গত এপ্রিল মাসের গুড্ ফ্রাইডে দিবসে সুষ্ঠ ভাবে সমপন্ন হয় স্থানীয় মিলন মন্দির মঞ্চে। আমরা অতি দুঃখের সংগে অভিভাবকদের কাছে

জানাই যে আমাদের পাড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা জাগৃতি সংঘের কাছে উক্ত উৎসব করবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রত্যাখ্যান করায় মিলন মন্দির ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু ও এস. ডি. ও. বারাসত যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। শ্রদ্ধেয় পদ্মশ্রী পঙ্কজ কুমার মল্লিক প্রখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়দ্বয়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সঙ্গীত শিল্পী শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষে পরিবেশিত হয় কবি গুরুর "চণ্ডালীকা" নৃত্যনাট্য, পরিবেশন করে "কিশলয় গীতবিতান" এর ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। এবার সত্যসেবী পরীক্ষায় সাতজন সোনার কাঠি ভাই ও বোন অংশ গ্রহণ করে। পত্রিকা বিভাগের কাজ শ্রীনিখিলেন্দু চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সুষ্ঠ ভাবে চলছে।

পরিষেশে আমি আশা করি এই শিশু সংগঠনের প্রতি আপনাদের ভাল বাসা ও সহানুভূতি চির অটুট থাকবে। আমি আবার উল্লেখ করতে চাই যে বড়দের আশির্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা মাথায় নিয়েই এগিয়ে চলছে "কিশলয় সব পেয়েছির আসর"।

———

সাহিত্য সংবাদ ও সিনেমা মাসিক

বিকিনি

আপনি নিজে পড়ুন, অপরকে পড়ান।

সম্পাদক : তুহিন বসু, সুধীর সেনগুপ্ত।

যোগাযোগ করুন :—১৬, বৈঠকখানা রোড,

কলিকাতা-৯

কথিকা

রামেন্দ্র সুন্দর

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

(আকাশবাণী কলিকাতা হইতে যুববাণীতে প্রচারিত)

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালী জাতির আশা, আকাঙ্খা ও উদ্দীপনার বীজ বপন করেছিলেন যিনি, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার নব জাগরণের পুণ্য লগ্নে এক উজ্জ্বল দীপ—বর্তিকা হাতে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিই হলেন অনন্য সাধারণ যুগপুরুষ আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। ১৮৬৪ সালের ২০শে আগষ্ট রামেন্দ্রসুন্দর মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দী গ্রামে মাতা চন্দ্রকামিনী দেবীর কোল আলো করে জন্মগ্রহন করেন। ছোটবেলা থেকেই পিতা গোবিন্দসুন্দরের প্রভাব ওর মধ্যে দেখা যায়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি ছোটবেলা হতেই। দারিদ্র ছিল সংসারে—তার সঙ্গে যুদ্ধ করে সতেরো বছর বয়সে বৃত্তি সহ তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও রামেন্দ্র সুন্দর ১৮৮৭ সালে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে সুবর্ণ পদক ও বৃত্তিসহ এম. এ. পাশ করেন। ঐ দুই শাস্ত্রেই রামেন্দ্রসুন্দর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন ১৮৮৮ সালে। **The Candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at that examination.**

পরীক্ষকগণের, সত্যই সুন্দর মন্তব্যের সঙ্গে সকলেই একস্বরে বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর সত্যই শ্রেষ্ঠ। ছাত্র জীবনের গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন শিক্ষাবিদ রামেন্দ্র-সুন্দর। তারই প্রথম পদক্ষেপ রিপন কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা শাস্ত্রের অধ্যাপনা। তাঁর অধ্যাপনা রীতির একটা বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি সর্বদা বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিয়ে প্রকৃত তথ্যকে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিতেন। মাতৃভাষা ভিন্ন শিক্ষাদান সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে না ; তা' তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর সহজ, সরল জীবন, জ্ঞানানুশীলন, তৎকালীন ছাত্র সমাজ ও শিক্ষক মণ্ডলীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সর্বদা ছাত্র ছাত্রীদের বলতেন—চর্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ।

মধুর চরিত্র ছিল তাঁর। তাঁর নিবন্ধ পাঠে ও আলোচনায় যোগদানকারীদের মিষ্টি মুখ না করিয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। তিনি ছিলেন ছাত্রদরদী আদর্শ শিক্ষক। ১৯০৩ সালে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন শিক্ষাচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধন ছিল তার জীবনের একমাত্র মূল মন্ত্র। আশৈশব তিনি সাহিত্যানুরাগী। তাইতো তিনি বলেছেন—"যথা শক্তি দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করিব।" কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করেও তিনি তার লক্ষ্য ঠিক রেখেছিলেন। জাতীয় জীবনকে প্রবুদ্ধ, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করেছেন বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁর চরিতকথা, বিচিত্র প্রসঙ্গে বিচিত্র জগৎ প্রভৃতি পুস্তক গুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ। নীরস বিষয়াদি তাঁর লিপি চাতুর্যে সহজ, সরল, সুন্দর ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গলায় সাহিত্য পরিষদ এর মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে সুউচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের গৃহ নির্মানের জন্য ভিক্ষা পাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে এতটুকু সংকোচ বোধ করেন নি তিনি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদকে সাহিত্য সেবীদের কাছে বঙ্গভারতীর মন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ আত্মমগ্ন উপাসক অতি অল্পই চোখে পড়ে। তিনি ছিলেন বাংলার ছেলে, বাংলা ভাষা ছিল তাঁর প্রাণ, ধ্যান ও সার্বিক উন্নতি। পরিষদের সভাপতি পদ গ্রহণের অনুরোধে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনে আকাঙ্খা,—পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহন করা আমার কাজ নহে।" এইরূপ নির্লোভ, নিঃস্বার্থ সাহিত্য সেবক পাওয়া, জাতির পক্ষে কি কম সৌভাগ্যের কথা ?

রামেন্দ্রসুন্দর পিতার কাছে দেশাত্মবোধের প্রেরণা পেয়েছিলেন। শৈশব থেকেই "জননী জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরিয়সী" মনে করেছেন। এই মাতৃমন্ত্রই ছিল তাঁর কাছে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনের অমূল্য সম্পদ। ধুতি চাদর ছাড়া অন্য কোন বেশে তাঁকে কেউ দেখেন নি কোনদিন।

তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। তাইতো তিনি উল্লেখ করেছেন—"আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশ প্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে। আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগে আস্ফালন না করে।" নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন ক্রমেই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় চিঠি পত্র পর্য্যন্ত লিখতেন না। "নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশীভাষা, পুরে কি আশা"—এই ছিল তার পরম বিশ্বাস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রামেন্দ্রসুন্দর-এর পরিকল্পনা—পরামর্শাদি জাতীয় জীবনে প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিল। তেমনি এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার অভিপ্রায়ে, "বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা" তার অমর সৃষ্টি। তৎকালীন ভাবোদ্দীপনার জীবন প্রতীক ছিলেন তিনি। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যসেবী শিক্ষাবিদ, দেশপ্রেমিক। আমাদের সর্ব্বকালের সমুজ্জ্বল জীবন আদর্শ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

———

প্রবন্ধ

।। রামমোহনের ছেলেবেলা ।।

স্বপন বুড়ো

নতুন ভারত গড়ে তুলেছেন রামমোহন।

রামমোহন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন—তখন দেশটা ছিল পরাধীন। আর জাতি হিসেবে আমরা ছিলাম – অন্ধবিশ্বাসে আর কুসংস্কারে ভরা।

কিন্তু সেই অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেও সারা দেশের জন্যে রাতদিন পরিশ্রম করে যে কত কাজ করে গেছেন—তাঁর জীবনী পাঠ করলেই সে কথা জানতে পারা যায়।

রামমোহনের নাম দেওয়া হয়েছে—"ভারত পথিক"। কিন্তু জীবনে যে যতই বড় হোন না কেন, প্রত্যেক মানুষেরই একটা ছেলেবেলা থাকে।

সেই ছেলেবেলাটা মা বাবার স্নেহ যত্ন ভালোবাসায় ভরা থাকে। কখনো সেই ছেলেবেলাটা থাকে নানা ধরণের স্বপন দিয়ে মালা গাথা। আবার কারো ছেলেবেলা দস্যিপণা আর দুষ্টুমী দিয়ে ও ভরা থাকে।

এই রামমোহন ছেলেবেলায় তার মা-বাবার কাছ থেকে স্নেহ-যত্ন-ভালোবাসা আর প্রেরণা লাভ করে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, ছোট্ট ফুলের গাছের মতো কিভাবে বেড়ে উঠেছিল, আমি শুধু আজ সেই কাহিনী, সেই গল্পই করবো।

খানাকুলের কাছে রাধানগর গ্রাম রামমোহনের জন্মস্থান। রামমোহনের বাবার নাম ছিল—রামকান্ত রায়। আর মায়ের নাম ছিল

—তারিনী দেবী। রামকান্ত জমিদার ছিলেন, বাড়ীর অবস্থা বেশ ভালো ছিল। যাকে বলে, রমরমা – গমগমা সংসার।

যে সময়ের গল্প তোমাদের কাছে বলছি, সেই সময়ে হিন্দুরা একের বেশী বিয়ে করতেন। রামকান্তও লোকাচার আর পরিবারের সামাজিক চলতি নিয়ম অনুসারে তিনটি বিয়ে করেছিলেন। রাম-মোহন, পিতার দ্বিতীয় পত্নী তারিনী দেবীর সন্তান। রামমোহনের আপন বড় ভাইয়ের নাম জগমোহন। রামকান্ত যে পরিবারের সন্তান তাঁরা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তারিনী দেবী ছিলেন শাক্ত বংশের মেয়ে। রামমোহন কিন্তু বাবার নিষ্ঠা আর মায়ের তেজস্বিতা—দুইই একসঙ্গে লাভ করেছিলেন। রামমোহনের একটি বড় ভাই ছাড়া একটি ছোট বোনও ছিল।

রামমোহন মায়ের কাছ থেকে অনেক সদগুণের অধিকারী হয়েছিলেন।

যদিও পরে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তার মা-বাবার মতের মিল হয়নি, তবু একথা মানতে হবে যে, রামমোহন যে ভালো ভালো গুণের অধিকারী হয়েছিলেন—সবই তার মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া।

তাই সারাজীবন ধরে রামমোহন যাকে সত্য বলে মনে করেছেন — তাকে শত বিপদেও ত্যাগ করেননি। এই ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কতবার রামমোহনের জীবন হানির আশঙ্কা ঘটেছে ; তবু চলার পথে অসংখ্য বিপদেও রামমোহন কখনো সত্যভ্রষ্ট হননি।

ছেলেবয়সেই রামমোহনের মায়ের কাছে অক্ষর পরিচয় হয়। মা তারিনী দেবী সংসারের হাজার হাজার কাজের মাঝেও ছেলেকে মুখে মুখে নানারকম গল্প বলতেন। সেই সব কাহিনী আর পুরাণের সব গল্প রামমোহন অবাক হয়ে শুনতেন। এরপর একজন গুরুমশাই বাড়ীতেই রামমোহনকে মুখে মুখে শুভঙ্করী শেখান। রামমোহনের

স্মরণশক্তি খুব প্রখর ছিল বলে দুই একবার শুনেই সে সব কিছুই গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারতেন।

কোন দেশের মানুষ কি রকম পরিবেশে বাস করে, কোথায় পার্বত্য অঞ্চল, কোথায় নদী সাগর বেশী, এসব জানবার আগ্রহ ছিল তার অসীম। বিভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার জানতেও তিনি খুব কৌতুহলী ছিলেন। এরই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করে নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন।

খুব ছেলেবেলা থেকে রামমোহন খুব মেধাবী ছেলে ছিলেন। বাবা রামকান্ত চেয়েছিলেন—তার মেধাবী ছেলে রামমোহন সকল দিক দিয়ে চৌকোস হয়ে গড়ে উঠুক। তাই তিনি তখনকার দিনে প্রচলিত সব রকম বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বাড়ীতেই অক্ষর পরিচয় ও সাধারণ জ্ঞান লাভের পর রামকান্ত ছেলের আরবী ও ফারসী পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—রামমোহনের বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর।

আরো মজার কথা যে, এই বয়সের মধ্যেই ছোট বেলা রাম-মোহনের দুটি বিয়ে দেন তাঁর মা-বাবা! এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা এই ছিল তখনকার সামাজিক বিধি। আট বছর বয়সে রামমোহনের প্রথম বিয়ে হয়। এই বিয়েকে একেবারে পুতুলের বিয়ে বলা যেতে পারে। তখনকার দিনের বাবা-মারা বোধ করি এই ভাবে পুতুলের বিয়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন। কিন্তু রামমোহনের প্রথম বিয়ে সুখের হয়নি। অল্পদিনের ভেতরই সেই পুতুল খেলার খেলাঘর ভেঙ্গে গেল, তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল। আবার নয় বছর বয়সে রামমোহনের বাবা তার দ্বিতীয়বার বিয়ে দেন। রামমোহনের প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল শ্রীমতী দেবী। তার পিত্রালয় ছিল বর্ধমান জেলার কুড়মণ পলাশী গ্রামে। রামমোহনের দ্বিতীয় পত্নীর নাম উমা দেবী। ইনি ভবানীপুরের মেয়ে। চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর নামে

ভবানীপুরে একটি রাস্তা আছে। উমাদেবী হচ্ছেন এই চন্দ্রনাথের পিসি।

নয় বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ের পর রামমোহন আবার পড়া শোনায় মন দিলেন।

রামমোহনের বাবা ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করবার জন্য পাটনায় পাঠিয়ে দিলেন, আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করবার জন্য। তখন সব বৈষয়িক কাজ আরবী ফারসীতে সম্পন্ন হ'ত। আরবী ও ফারসী ভালো করে শিখতে না পারলে ছেলে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে না এই দূরদৃষ্টি নিয়ে পিতা রামকান্ত যাতায়াতের সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই বালককে পাঠিয়ে দিলেন – সুদূর পাটনা শহরে। তখনকার দিনে ইসলাম সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থল ছিল পাটনা শহর। সেখানে বহু শিক্ষিত মৌলভী বাস করতেন। তাঁদের শিক্ষাদান গুণে বালক রামমোহন অতি অল্পকালের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আরবী ভাষায় রামমোহন ইউক্লিড ও অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থও পাঠ করেন। তখনকার দিনে আরবী ও ফারসী ভাষার মাধ্যমেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যেত। এই খানে রামমোহন কোরান পাঠ করে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আরবী ও ফরাসী ভাষা অতি অল্প দিনের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে, রামমোহনের নতুন নাম হল—"জবরদস্ত মৌলভী"!

রামকান্ত কিন্তু এতেই খুশী হলেন না। তিনি এর পর রামমোহনকে পাঠালেন বারানসী ধামে। সংস্কৃত ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে বারানসীর প্রসিদ্ধি ছিল। মনে আকাঙ্খা, ছেলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে।

বালক রামমোহন পিতার সে ইচ্ছাও পূর্ণ করলো।

চৌদ্দ বছর বয়সে রামমোহনের মনে একবার সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের আকুল আকাঙ্খা জাগে। এই সময় তার এক

বন্ধু জুটেছিল। তার কাছেই সে নানা দেশ ভ্রমণের কথা শুনে বিভিন্ন দেশ দেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ফলে সে আর সংসারে থাকবে না, সন্ন্যাসী হয়ে সারা ভারত পরিভ্রমণ করবেন এই সঙ্কল্প করে ফেলেন।

কিন্তু ছেলেবেলায় রামমোহন খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের অনুমতি না নিয়ে ত গৃহত্যাগী হওয়া যায় না।

এইখানেই গোলযোগের সূত্রপাত হ'ল। মাতা তারিনী দেবী কিছুতেই চৌদ্দ বছরের বালককে নিজের কোল খালি করে অনিশ্চিত পথে ছেড়ে দেবেন না। তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে না যেতে রাজী করালেন।

অবশেষে মাতৃ স্নেহেরই জয় হ'ল।

এরপর রামমোহন ষোল বছর বয়সে হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। হিন্দুধর্মে বহু বিধিনিষেধ ও কুসংস্কার তার মনে বহু জটিল প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। এই আত্ম-জিজ্ঞাসা থেকেই তার পুস্তক রচনা। এই পুস্তিকা প্রকাশের পর তার রক্ষণশীল পরিবারের সঙ্গে মতান্তর ঘটল।

পিতা রামকান্ত তার ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হলেন।

ফলে রামমোহন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে অজানার আহ্বানে বহির্গত হলেন।

এই ষোল বছর বয়স থেকেই সে 'ভারত পথিক'। শোনা যায় এই সময়েই সে জীবন বিপন্ন করে তিব্বত গিয়েছিলেন। আর বহু বিপদের মুখে পড়েছিলেন। তিব্বতের মেয়েরা স্নেহবশে অনেকবার তার জীবন রক্ষা করে। তারা অনেকেই রামমোহনকে মায়ের স্নেহে আগলে রেখেছিল।

পরে অবশ্য রামকান্ত পুত্রস্নেহে রামমোহনকে স্বগৃহে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি ছেলেকে জীবিতাবস্থাতেই বহু পৈতৃক সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন।

পরিবারের বিগ্রহ সেবা নিয়ে পরবর্তী কালে মায়ের সঙ্গে রাম মোহনের বহুবার মতবিরোধ ঘটে। একবার যাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন তাকে কখনই পরিত্যাগ করেননি রাজা রামমোহন। এই বিরল গুণটি রামমোহন পিতা-মাতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

— × —

ছড়া

"সোনার ছড়া"

সরল দে

লতায় সোনা
পাতায় সোনা
ফুলেও সোনা ঝরে,
সোনার আলো
ঝিলমিলিয়ে
লতা-পাতায় নড়ে।

আলো-ছায়া
নকশি কাঁথার
নকশা যেন আঁকে,
আকাশ আলো
হাতছানি দেয়
বাইরে দূরে ডাকে।

আলোর সোনা
মন কে সোনা
বন কে সোনা করে,
সোনাবরণ
মায়ের হাসি
ছড়ায় ঘরে ঘরে॥

গল্প গুচ্ছ

॥ দুর্ঘটনা ॥

অলোক চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষা পাশের খবর শুনে সুরজিৎ যতটা উল্লসিত হয়েছিল, মাসীমার পাঠানো পার্শেলটা খুলে ঠিক ততটাই ম্রিয়মান হয়ে গেল।

কোন ভাল প্রেজেণ্টেশন নয়, বইপত্তর কিছু নয়। একগাদা তিলের নাড়ু। একটা চিরকুটে লেখা – 'সুরজিৎ, তুই আগেরবার আমার তিলের নাড়ু খেয়ে ভাল বলেছিলিস, তাই তোর পরীক্ষা পাশের খবর পেয়ে অন্যকোন উপহার না পাঠিয়ে তিলের নাড়ু পাঠালাম।

—ইতি

মাসীমা।

আগের বারের কথা সুরজিৎ ভোলেনি। দিল্লী থেকে মাসীমার পাঠানো নাড়ু খেতে গিয়ে তার একটা নড়বড়ে দাঁত পড়ে গিয়েছিল আর একটা কাঁচা দাঁত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এত কাণ্ড করে পুরো চারঘণ্টার চেষ্টায় আধখানা নাড়ু সে অবশ্য খেয়েছিল। তারপর নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে মাসীমাকে চিঠিতে লিখেছিল নাড়ুর ভুবন ভোলানো স্বাদের কথা। সেই সৌজন্যের ফল যে এ রকম হবে তা কে জানত।

সুরজিৎ তৎক্ষণাৎ পার্শেলটা উপুড় করে টেবিলে ঢেলে ফেলল।

আর একটা বিজাতীয় জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে সেই বজ্রকঠিন নাড়ু গুলোকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়তে লাগল।

আলুর আড়তদার নিবারণ সামন্ত একলাই তার ক্যাশবাক্সের সামনে বসেছিলেন। তখনও তার দুজন কর্মচারীর একজনও আসেনি। তিনি একটা ড্রয়ার খুলে খুচরো পয়সা গুনে গেঁথে রাখতে রাখতে একটা দু-পয়সা তার হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে একপাশে রাখা তক্তপোশের নিচে গিয়ে ঢুকল।

নিবারণ সামন্ত প্রায় হাঁকপাঁক করে সেটার পেছনে ছুটলেন। দুটো পয়সা হারানো কম কথা নয়। আজ দুটো হারাচ্ছে বলে যে কাল দশটা হারাবে না তা কে বলতে পারে? আর তারপর পঞ্চাশটা, শেষকালে আস্ত টাকাই হয়ত হারালো একটা। এভাবে চালালে দুদিনে তার কারবার লাটে উঠে যাবে। কাজেই নিবারণ সামন্ত সটান শুয়ে পড়লেন তক্তপোষের নিচে।

কিছুক্ষণ হাতড়ে সবে পয়সাটা পেয়েছেন এমন সময়ে হঠাৎ তার মনে হল কি সব যেন অনাহুত, অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত জিনিষে তার ঘরের আবহাওয়াটা ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি তক্তপোষের নিচে থেকে তিনি মুণ্ডুটা বার করে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে গেলেন, আর অমনি ভয়ঙ্কর শক্ত গোলপানা একটা রোমহর্ষক চেহারার বস্তু তার নাকের ডগায় এসে আঘাত করল।

নিবারণ সামন্ত আবার তক্তপোষের নিচে ঢুকে গেলেন। তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতে লাগলেন সেই বিচিত্র বস্তুগুলো একের পর এক এসে তার ঘরে ঢুকছে।

পোড় খাওয়া লোক নিবারণ সামন্ত। মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন তার অফিস ঘর আক্রান্ত হয়েছে। আর অফিস ঘর মানেই ক্যাশ-বাক্স। আর তার মধ্যেই·····

পাঁচ মিনিট বাদেই দোকান ঘরের সামনে বেশ একটা ভীড় জমে গেল। কয়েকজন উৎসাহী লোক সাহস করে ঘরের ভেতর উঁকি

মেরে দেখল নিবারণ সামন্ত তক্তপোষের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আর সারা ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে গোল গোল হোটখাটো সাইজের কতকগুলো বিচিত্র বস্তু। সংখ্যায় তারা অন্ততঃ ত্রিশের কম হবে না।

লোকেরা বুঝতে পারল নিবারণ সামন্ত ঐ তক্তপোশের তলা থেকেই মুহুর্মুহু—'ডাকাত, ডাকাত, বাঁচাও মেরে ফেললে' ইত্যাদি চীৎকার করছিলেন।

থানার ও. সি. বটকৃষ্ণ তালুকদার বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে সামনের চেয়ারে বসা সাব ইনস্‌পেকটর অভয়পদকে বললেন—"না হে অভয়পদ, এ সব তো বোমা টোমা নয়। এ হল পিত্তর তিলের নাড়ু। বিশ্বাস না হয় তুমি একটা খেয়েই দেখো না—

অভয়পদ শশব্যস্ত হয়ে বলল—"না স্যার, আমার পেটটা ভাল নেই—বোমাই হোক আর তিলের নাড়ুই হোক, হজম করা মুস্কিল হবে।"

বটকৃষ্ণ বাবু হতাশ কণ্ঠে বললেন—"আচ্ছা থাক তবে আমার কাছেই।" অভয়পদ চলে গেলে বটকৃষ্ণ বাবু মনে মনে প্ল্যান এঁটে ফেললেন। গতমাসে তার শ্যালিকা দিল্লী থেকে তাকে একটা ছোট পার্শেল ভর্তি আরশোলা পাঠিয়ে খুব ঠকিয়ে ছিল। এবারে তিনি তাকে এই নাড়ু পাঠিয়ে জব্দ করবেন।

বটকৃষ্ণ বাবু উৎফুল্ল মুখে গালে হাত বোলাতে লাগলেন। একটা দাঁত একটু যেন নড়ছে। তিনি ইতিমধ্যেই একটা নাড়ুর স্বাদ পরখ করে দেখতে গিয়েছিলেন।

দিন সাতেক বাদে সুরজিৎ দিল্লী থেকে মাসীমার একটা চিঠি আর একটা ছোট পার্শেল পেল।

এ কথা, সে কথার পরে মাসীমা লিখেছেন—"গত সোমবার আমার এক সই এসে আমায় গোটা কুড়ি তিলের নাড়ু দিয়ে গেল, কলকাতা থেকে তার এক জামাইবাবু নাকি পাঠিয়েছেন। তোর

মেসো খেয়ে বলল সেগুলো নাকি আমার তৈরী নাড়ুগুলোর থেকে ঢের ভালো। অথচ খেতে গিয়ে ওর দুটো দাঁত নড়ে গেছে, আর আমার গতবারে করা নাড়ু খেতে গিয়ে নড়েছিল একটা মাত্তর দাঁত। আমি অনেক করে বুঝিয়ে প্রমাণ করতে গেলাম যে আমারটাই আসলে ভাল হয়েছিল। কিছুতেই বিশ্বাস করল না। শেষকালে বলল সুরজিৎ তো তোমার নাড়ুর খুব সমঝদার ওকেই খাইয়ে দেখো, কি বলে। তাই তোকে কটা সইয়ের নাড়ু পাঠালাম। আমার করা নাড়ু তো এই ক'দিন আগেই খেয়েছিস —

এই অবধি পড়ে সুরজিৎ পার্শেলটা খুলে দেখল তাতে চারটে নাড়ু রয়েছে। সেই আদি ও অকৃত্রিম চেহারা। তার মাথাটা ঝিনঝিন করতে লাগল।

———

কিশলয়-এর মেলা পড়ুন—অপরকে পড়ান

নিজে লিখুন—অপরকে লিখতে উৎসাহ দিন।

চিন্তা করছেন গম কোথায় ভাঙ্গাবেন

আবার ভাবছেন বিচালী কাটাবেন কোথায়

আমি তো আছি—

সন্তোষ পাল

॥ গম আর বিচালী কাটার কল ॥

নবব্যারাকপুর ষ্টেশন রোড (পশ্চিম),

নব-ব্যারাকপুর

॥ বিপুল সমরোহ ॥

শ্রীধীমান

১৫/১/১ মহাত্মাগান্ধী রোডের নিউ বেনারসী হাউসের ফোনটা কিছুতেই ধরতে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমার মেয়ে বল্লে, "বাবা তুমি বরং ভোলা বাবুর [শ্রী ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায়] মেয়ে রুবিকে বা ছেলে অশোককে ওদের বাড়ীতে ফোন কর। তাও চেষ্টা করলাম কিন্তু সেখানেও ওই কোঁ···কোঁ···বাজিং অর্থাৎ এনগেজ্‌ড। ডায়েল করলাম ৯৯৯-উত্তর এল,—বল্লাম,···আপনি আমাকে দয়া করে ৩৪-৮৮৮৫ নম্বরটি কাইণ্ডলী দেবেন ? প্লিজ। কানেকসান দিলেন বটে,···কিন্তু কানে ভেসে এল কথা—ক্রস কানেকসানে কথা হচ্ছে।

"ভোলাবাবু নেই দোকানে ?" আপনি কি সুশীলবাবু [সুশীল মুখার্জী] ? আমি সুভাষ ব্যানার্জী কথা বলছি।

"ভোলাবাবু কোথায় ?"

"ভোলাবাবু, সুশীলবাবু, অশোকের থিয়েটার দেখতে গেছেন।"

আরে আমিও তো সেই থিয়েটারে যাবো। কোথায় হচ্ছে যেন ?

"ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটে।"

ঠিক আছে ? ভোলাবাবু নিজে শিল্পী, বেতারে রেকর্ডে, রঙ্গমঞ্চে ওর কত নাম। ছেলেটিও বাবার মত হয়েছে। রুবি বার বার করে বলে দিয়েছিল আসবেন কিন্তু দাদার অভিনয় দেখতে কিন্তু কোথায় হচ্ছে সেইটেই শুনতে ভুলে গেছি। আর থাকতে না পেরে—একটু উচ্চকণ্ঠেই বল্লাম—

"বাবু মশাই একটু থামবেন ··নিউবেনারসী হাউস থেকে কয়েক খানা পূজোর কাপড় কিনবো—একটু কথা বলতে চাই।"

"নিশ্চয় ··নিশ্চয়···আমি ছেড়ে দিচ্ছি···এবার ওদের পূজোয় নানান রকম শাড়ীর বিপুল সমারোহ, কথা বলুন"।

———

শ্যামল কুমার বসু

তিন অক্ষরে নাম তার সর্ব্বগৃহে রয়।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে বনেতেই হয়॥
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে মানুষেতে খায়।
শেষের অক্ষর না ধরিলে ধানি জমিতে রয়॥

—হরেন্দ্রনাথ হাইত

২। তিন অক্ষরে নাম মোর প্রসাদ রূপে পাও,
মাথা কাটলে তোমরা আমায় বিয়ে বাড়ী নিয়ে যাও।
পেট কাটলে আমি তবে লোককে আশ্রয় দিই,
পুচ্ছটিকে কাট্‌লে পরে বেড়ার বাড়ী রই॥

—মানস ঘোষ

এই সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাঁ দুটির উত্তর ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নতুন ধাঁধাঁ [উত্তর সমেত] আগামী ২০/১০/৭৩ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌছে দিতে হবে।

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর—১। আমড়া ২। বাতাস

দুটি উত্তর ঠিক হয়েছে যাদের—স্বপ্না ভট্টাচার্য্য, চঞ্চল চক্রবর্ত্তী, সৌমেন চক্রবর্ত্তী, অমিতাভ রাহা রায়, মৌসমী চক্রবর্ত্তী, নীলিমা ভৌমিক, শিলা দাস, উৎপল চক্রবর্ত্তী, পার্থ প্রতিম রায়, অনিরুদ্ধ রাহা রায়, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য, সুধীর বসু, সৌম্যেন বসু, রাখি বসু, জয়দেব চক্রবর্ত্তী, পম্পা সিনহা, তিমির বরণ রায়, গৌতম বসু, কমল বসু, সোমা রাণী ভট্টাচার্য্য, রীতা রাণী বিশ্বাস, মাল্লনাথ মজুমদার, অমিত গুহ ঠাকুরতা, সেখ নূর আলী, মিতলী দাস, বেবী শর্ম্মা, ইতু দাস, বাবলী দাস, অঞ্জন দাস, মনীষা সুর, নমিতা বসু, ভবতোষ বিশ্বাস, ঝর্ণা বসু, নিবেদিতা বসু, সপ্না দাস, সোমনাথ রায়, সমীর বসু, হরেন হাইত, রত্না চ্যাটার্জী, মঞ্জু মুখার্জী, সুভদ্রা ব্যানার্জী ও নরীন্দর কর।

দ্বিতীয়টি যাদের ঠিক হয়েছে—মনিমালা সেন গুপ্ত, যুথিকা ব্যানার্জী, কণক শর্ম্মা, পিযুষ শর্ম্মা, দেবাশীষ সমাজপতি, প্রবীর সেনগুপ্ত, তমাল কান্তি মজুমদার।

———

কিশলয় সব পেয়েছির আসর

অভিভাবকেরা বিশেষভাবে নজর দিন।

১। আসরে ভর্ত্তি হইবার জন্য ·৮৫ টাকা এবং পত্রিকা ২·০০ মোট ২·৮৫ টাকা।

২। মাঠ আরম্ভ হয়ঃ— শীতকাল, বিকাল ৪·৩০ ও গ্রীষ্মকাল বিকাল ৫টা, মাঠ আরম্ভ হওয়ার ১০ মিঃ পর পর্যন্ত মাঠে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

৩। পর পর তিন দিন মাঠে অনুপস্থিত থাকিলে অভিবাবকের উপযুক্ত কারণ দর্শহিয়া চিঠি দিতে হইবে, নতুবা মাঠে প্রবেশধিকার দেওয়া হয় না।

৪। প্রতিমাসের চাঁদা (২০ পয়সা) পরবর্ত্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাঠে জমা দিতে হইবে।

৫। আসরের ড্রেস বাধ্যতামূলক ভাবে তৈরী করিতে হইবে।

আসর সংবাদ

শ্যামল বসু
(বার্তা সম্পাদক)

গত ৩১ শে জুলাই '৭৩, নবাকাঙ্খী সব পেয়েছির আসরের সোনার কাঠিদের সংগে আমাদের সোনার কাঠিদের ও ১১ই আগস্ট '৭৩, আমাদের আসরের কর্মীদের সংগে উক্ত আসরের কর্মীদের মধ্যে এক প্রীতিমূলক ফুটবল খেলা মিলন মন্দির মাঠে সম্পন্ন হয়। কর্মীদের খেলা পরিচালনা করেন আমাদের আসরের কর্মী অনাদী মুখার্জী। উক্ত দুই খেলায় আমাদের সোনার কাঠি ও কর্মীদল যথাক্রমে, গোলে ও ৪-০ গোলে জয়লাভ করে।

১৫ই আগষ্ট '৭৩, আমাদের সোনার কাঠি ভাই-বোনেরা স্বাধীনতা দিবস পালন করে। প্রভাতে ভাই-বোনেরা ও কর্মীরা বাদ্য-বাঁশী পতাকা ও ফেষ্টুন সহ এক সুন্দর বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী বের করে। এই প্রভাত ফেরী সোদপুর রোড ধরে মধ্যমগ্রামের বহুমুখী সংসদ প্রাঙ্গনে সমবেত হয়। সেখানে পতাকা উত্তোলনের পর আমাদের সংঘমিত্র শ্রীকমলা রঞ্জন বিশ্বাস ও ঐ আসরের একজন অভিভাবক শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমাদের কুচকাওয়াজ সচিব শ্যামল বসু অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। আমাদের প্রভাত ফেরী মধ্যমগ্রাম অঞ্চল পরি-

ক্রমার পর নব-বারাকপুর অঞ্চলে প্রবেশ ক'রে—"ইয়ুথ গার্ডস" ক্লাবের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

আসরে ফিরে এসে আমাদের প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলন করেন সহ-সংঘমিত্র শ্রীতড়িৎ কান্তি রায়। তিনি শহীদ বেদীতে মালা দান ক'রে সময়োপযোগী ভাষন দেন। বেলা ১০টা নাগাদ প্রভাতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়।

প্রভাত ফেরী ও আসর প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দপ্তর সচিব প্রবোধ ব্যানার্জী ও পঙ্কজ দে, প্রভাত ফেরী ও বাদ্য বিভাগ পরিচালনা করেন যথাক্রমে সাংস্কৃতিক সচিব পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী ও প্রধান সচিব পুলক চৌধুরী।

বৈকালিক অনুষ্ঠান ৪-৩০ মিনিটে আসরের সংকল্প বাক্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। প্রকৃতির বাঁধায় বৈকালিক আভি প্রদর্শনি দেখান সম্ভব হয় না। সন্ধ্যায় ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে সংঘমিত্র শ্রীবিশ্বাস মহাশয় ও অসিত রায় মহাশয়। সভাপতি ভাষণে ছোটদের খেলাধুলার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেন। আমাদের সহ-সংঘমিত্র মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে ঋষি অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। কৃতি সোনার কাঠিরা সংঘ-মিত্রের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। যাঁরা আমাদের উৎসবকে সুসম্পন্ন করে তুলতে নানাভাবে সহযোগীতা করেছেন তাঁদের এবং উপস্থিত অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পত্রিকা সম্পাদক নিখিলেন্দু চক্রবর্ত্তী।

"মাঠে মাঠে" আগামী সংখ্যায় চমকপ্রদ
খবর দিচ্ছে খেলুড়ে ভাইরা।

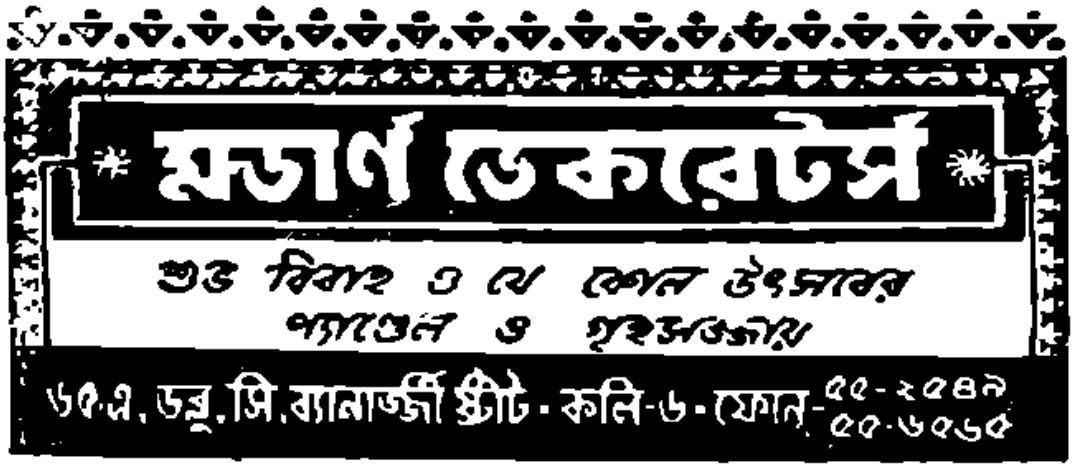

With best complements of :

NATIONAL MOTORS

3 BARETTO LANE, CALCUTTA-1.

Phone 23-6084

With best complements of

DEV-ALL PRIVATE LIMITED

Dealers of **BURMA-SHELL**

243-E, ACHARYA PRAFULLA CHANDRA ROAD,
CALCUTTA-6.

With all best wishes from

PARIBESAK

Caterer of Distinction & Govt. Caterer.

Phone 44-1964

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজের ব্যবসায় গড়ে তুলুন।

॥ এই প্রকল্প ম্যাট্রিক বা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় পাস অথবা অধিকতর গুণসম্পন্নদের জন্য ॥

ব্যবসায় করতে গেলে মূলধন লাগবেই। যতটা মূলধনের প্রয়োজন তার শতকরা নব্বই ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক সংস্থা থেকে সংগ্রহ করুন। বাকী দশভাগ পর্যন্ত টাকা সরকারই আপনাকে দেবেন ঋণ হিসাবে, দীর্ঘ মেয়াদী ও কম সুদে।

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জেলায় : ডিস্ট্রিক্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অফিসার
কটেজ অ্যাণ্ড স্মলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রীজ ডিরেক্টরেট

কলিকাতায় : এমপ্লয়মেণ্ট সেল,
কটেজ অ্যাণ্ড স্মলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রীজ ডিরেক্টরেট,
নিউ সেক্রেটারিয়েট (একতলা),
কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

আপনি যদি উদ্বাস্তু হন তাহলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জেলায় : ডিস্ট্রিক্ট রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার।

কলিকাতায় : ডিরেক্টর অব ইমপ্লিমেণ্টশন,
রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিরেক্টরেট,
১০ ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচী ॥

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জন সংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

ফোন : ৫৫-৭১২১

তরুণ অপেরা

১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

এবারের শারদীয়া অর্ঘ্য—

কার্ল মার্কস

রচনা—শম্ভু বাগ, নির্দেশনা—অমর ঘোষ

সুর—প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য্য

তাজমহলের কান্না

রচনা ও সুর—পরেশ ধর

প্রতিটি পালার শ্রেষ্ঠাংশে—

শান্তি গোপাল

ম্যানেজার—তারাপদ ঘোষ ব্যবস্থাপক—শিব ভট্টাচার্য্য

৺শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

শুভ বিবাহে ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহ সজ্জার জন্যে—

নববারাকপুর ডেকরেটর্স

নব বারাকপুর ষ্টেশন রোড (পশ্চিম)

নববারাকপুর, ২৪ পরগণা।

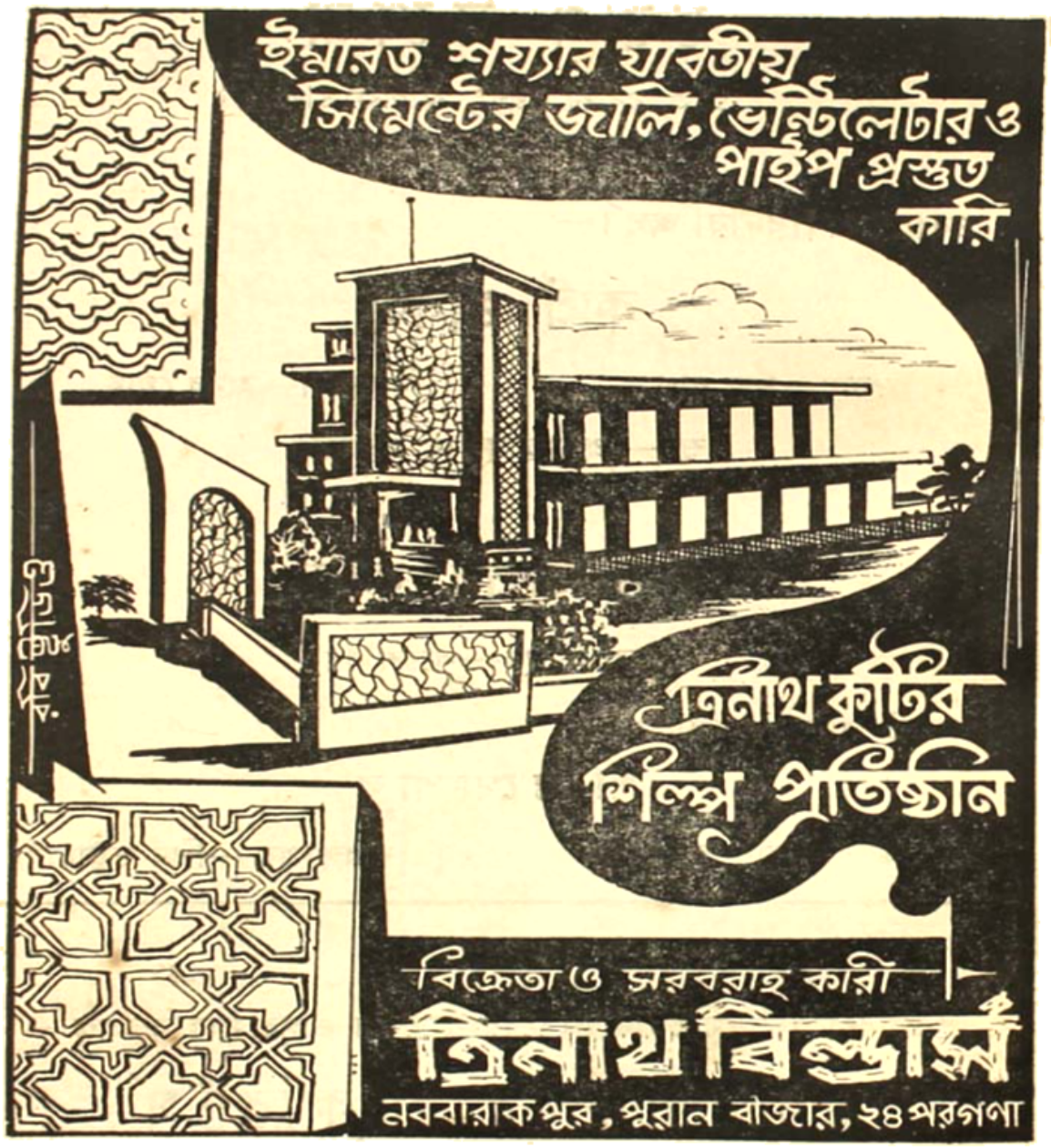

পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও ফ্যান্সি আর্ট প্রেস ১০, মদন বড়াল লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত

With best compliments :

— On this auspicious occasion —

To their patrons

From

M/s. Rajkamal Biscuit Mfg. Co.

62, DR. SUDHIR BOSU ROAD,
CALCUTTA - 23.

●

Manufacturer of best quality
BISCUIT & MILK BREAD.

With best compliments from :

●●
●

M./s. B. K. ROY CHOWDHURY & CO.

Engineers & Govt. Building Contractor.

15, HARI GHOSH STREET,
CALCUTTA - 6.

অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে নৃত্য ও সঙ্গীত
শিক্ষা দেওয়া হয় :—

কিশলয় গীত বিতান

সঙ্গীত বিভাগ :

শিক্ষক—শ্যামল বসু
ভর্ত্তি ফি—টাকা ৫·০০
মাহিনা— ৮·০০

নৃত্য বিভাগ :

শিক্ষক—মন্টু সরকার ও শীপ্রা সরকার
ভর্ত্তি ফি—টাকা ৩·০০
মাহিনা— ▲
১ম বর্ষ—টাকা ৩·০০
১য়-৩য় ,,—
৪র্থ ,,—
৫ম ,,—
৬ষ্ঠ ,,—

সাক্ষাত সময় :—প্রত্যহ বিকাল ৫টা হইতে ৬-৩০ মিঃ
রবিবার ও ছুটির দিন :—সকাল ৯টা থেকে ১১টা
স্থান :—আসর কার্য্যালয়

পরিচালনায় :

কিশলয় সব পেয়েছির আসর

নব-বারাকপুর

বিশেষ আকর্ষণ :—সঙ্গীত ও নৃত্যে প্রভাকর পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মূল্য —১·০০ টাকা